সরস্বতী

॥ সাহিত্যলোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক :
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর :
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
প্রসেস সিন্ডিকেট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
সাহা বাইন্ডিং ওয়ার্কস্
১৬৬ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

সরস্বতী প্রসঙ্গে

এই ধরনের বই বাংলা ভাষায় এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। এবং মনে হয় কিছুকাল ধরিয়া এই বই একক ও অদ্বিতীয় হইয়াই থাকিবে। এই বইয়ে সরস্বতী দেবীর কল্পনার উদ্ভব ও বিকাশ এবং শিল্পে, ধার্মিক অনুষ্ঠানে ও সামাজিক জীবনে এই কল্পনার প্রকাশ আলোচিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নানামুখী আলোচনা ও গবেষণার সহিত বাঙ্গালী পাঠক সুপরিচিত। ইনি বঙ্গভাষায় গবেষণার একটি অভিনব ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এই ধরনের দেবতত্ত্ব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় আরম্ভ করেন—পরিষৎ-পত্রিকায় তিনি কতকগুলি হিন্দু দেবতার কল্পনার বিকাশ পর পর বিভিন্ন শাস্ত্র ধরিয়া দেখাইয়াছিলেন। সরস্বতীর আলোচনাও ঐ সঙ্গে প্রকাশিত হয়—প্রস্তুত পুস্তকের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত আকারেই রচিত হইয়াছিল।

এই পুস্তকের 'সূচনা'তে প্রথম শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেবতাবাদ ও দেবমূর্তি কল্পনা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বিচার করিয়াছেন। তৎপর সরস্বতীর বন্দনা ও সরস্বতীর বিশেষ বিশেষ উৎসব সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তদনন্তর তিনি সরস্বতী দেবীর কল্পনার ইতিহাস দিয়াছেন—বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীর তীর যখন আর্যগণের নিবাস ছিল তখন কি করিয়া নদীরূপা দেবী সরস্বতীর উদ্ভব হইল, কি করিয়া বাগ্দেবীর সহিত অভিন্না হইয়া গেলেন, বেদ-সংহিতায় সরস্বতীর কল্পনাই বা কিরূপ ছিল, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে সরস্বতীর সম্পর্কীয় নানা উপাখ্যান কেমন ভাবে আসিয়া গেল, সরস্বতীর পূজা ও বলির ব্যবস্থা বৈদিক শাস্ত্রে ও আধুনিক লোকাচারে কি ভাবে বিদ্যমান—এই সকল বিষয়ের অবতারণা আছে।

ইহার পর সরস্বতীর ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অনুমোদিত ও ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে প্রদর্শিত বিভিন্ন সরস্বতী মূর্তির আলোচনা আছে। এই অংশ বোধগম্য করিবার পথ প্রচুর চিত্র দ্বারা গ্রন্থকার সহজ করিয়া দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে এই অংশে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক, মহাযান বৌদ্ধ ও জৈন দেবতত্ত্বের ও দেবার্চনার নানা কথা দেওয়া হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ্য দেবতত্ত্বে সরস্বতীর স্থান কোথায়; মহারাজ ভোজরাজ কর্তৃক ১০৯১ সংবতে স্থাপিত সরস্বতী মূর্তির পরিচয়; তিব্বত ও জাপানে সরস্বতী মন্দির, সরস্বতীর যন্ত্র,—প্রভৃতি কতকগুলি প্রকীর্ণ বিষয়ের আলোচনানন্তর পুস্তকের পরিসমাপ্তি।...

সরস্বতী পুস্তকে শাস্ত্র ও শিল্প উভয় অবলম্বন করিয়া দেবতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। আশা করি তাঁহার এই বইয়ের বহুল প্রচার হইবে—বঙ্গদেশের প্রত্যেক পুস্তকাগারে এই বই রাখা কর্তব্য।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবেদন

পরমপূজ্য পিতৃদেব রচিত 'সরস্বতী' গ্রন্থখানি প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে এর প্রথম প্রকাশ। পিতৃদেবের ইচ্ছা ছিল বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করার। তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে সরস্বতী সম্বন্ধে প্রাচীন লেখমালার কিছু তথ্য পাওয়া গেছে—সেগুলি পরিশিষ্টে সংযোজন করা গেল। সরস্বতী বস্তুত ছবির অ্যালবাম এবং বক্তব্যে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর জাতের রচনা। কাজেই এই বইএর পুনঃপ্রকাশ যে কোনদিন সম্ভব হবে ভাবিনি। উৎসাহী প্রকাশক শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষের আন্তরিক আগ্রহ ছাড়া এ বই প্রকাশ সম্ভব হত না। শ্রীমান্ বিমলকুমার পাল নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের শ্রমসাধ্য কাজের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করায় আমার ক্লেশ লাঘব হয়েছে। প্রুফ-সংশোধনে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৪১) 'সরস্বতী'র যে সমালোচনা করেছিলেন তার অংশবিশেষ বর্তমান গ্রন্থের মুখবন্ধ হিসেবে ব্যবহার করা হল। ২১ ও ৪৬ সংখ্যা চিত্র অনিবার্য কারণে প্রকাশিত হয় নি।

১২বি, মোহনবাগান লেন
কলিকাতা-৪
১৩৬৭ আশ্বিন

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র সংখ্যা নাম

সরস্বতী

(ব্রিটিশ মিউজিয়ম)

অনুভূতি সকল জীবেরই আছে। জীবের জীবত্ব বা অনুভূতি নিত্যসম্পৃক্ত। জীবের স্বভাব-সুখকর অনুভূতি যাহা জীব তাহাই চায়। দুঃখের অনুভূতি হইতে জীব সর্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। সুখানুভূতি জীবের পক্ষে স্বাভাবিক, দুঃখানুভূতি অস্বাভাবিক,—সুখ বাধা পাইলেই দুঃখানুভূতি হয়। যখন প্রকৃতির কার্য অবাধে চলে, তখনই সুখ ; প্রকৃতির কার্যে বাধা উপস্থিত হইলেই দুঃখ হয়।

সুখ, ইষ্ট, দুঃখ অনিষ্ট। ইষ্টানিষ্ট হইতে ধর্মাধর্ম। যাহা স্বাভাবিক তাহাই ধর্ম, যাহা অস্বাভাবিক তাহাই অধর্ম। সুখের দিকে ধাবমান হওয়া জীবের স্বভাব ; সুতরাং জীবের তাহা ধর্ম।

আহার, নিদ্রা ও মৈথুন জীবমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম। মানুষ ও ইতর জীবে প্রভেদ এই যে, মানুষকে কতকগুলি অতিরিক্ত ধর্ম পালন করিতে হয়। জীবের ধর্ম স্ব-স্ব প্রকৃতি অনুসারে। মানুষের প্রকৃতি অনুসারে মানুষের ধর্ম। প্রকৃতিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না ; সুতরাং মানুষ স্বপ্রকৃতি অনুসারে চলিতে বাধ্য। যখন মানুষ নিম্নস্তরে থাকে, তখন দুঃখ পরিহার করিবার চেষ্টাই তাহার ধর্ম। যাহা মানুষকে সুখ দেয়, যাহা দুঃখ দেয়, মানুষ প্রথমাবস্থায় তাহাকে শক্তিমান্ বলিয়া মনে করে। তাই মানুষ সে অবস্থায় সুখদায়কের উপাসনা করে, দুঃখদায়ককে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতে চেষ্টা করে। পূজার অর্থ সন্তুষ্ট করা। দুঃখের নিগ্রহ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাই দুঃখের দেবতার পূজাই প্রথমে বিহিত হয়।

কারণানুসন্ধানপ্রবৃত্তি মানুষেরই আছে, ইতর প্রাণীর নাই। সুখ স্বাভাবিক ; প্রকৃতির গতি বাধা না পাইলে, সুখের অভাব হইবে না। কিন্তু দুঃখ হয় কেন ? প্রকৃতির গতি বাধা পাইলে তবেই তো দুঃখ। এ বাধা কে দেয় ? এমন কোন শক্তি আছে যাহা প্রকৃতির স্রোতে বাধা দেয়। সে শক্তিকে কেহ দেখিতে পায় না, তাহার কোন মূর্তি নাই। কিন্তু মানুষ যাহা আছে বলিয়া জানে, তাহার একটা মূর্তি কল্পনা করিয়া লইতে বাধ্য হয়। যাহার মনের যেরূপ গঠন, তাহার কল্পনার গঠন সেইরূপ হয়। নিম্নস্তরের মানুষের কাছে দুঃখ দেবতামূর্তি গ্রহণ করিয়া আসে। মানুষ তাহাকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিবার চেষ্টা করে। ধর্মের প্রথম স্তরে ভূত, প্রেত প্রভৃতির পূজা প্রচলিত হয়। সেই সময় মানুষ বৃক্ষাদিতে বা মূর্তিতে এই সকলের পূজা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় স্তরে মানুষ শুধু দুঃখের পরিহার করিয়া সন্তুষ্ট হয় না। সুখের উপাসনায় তাহার প্রবৃত্তি হয়। প্রকৃতির যে অবিরাম স্রোত, যাহা জীবের সুখের নিদান, তাহারও তো কর্তা আছে। এই অবস্থায় দুই শক্তির অনুভব হয়, প্রকৃতির

স্বাভাবিক প্রবাহ এক শক্তির কার্য, সেই প্রবাহে বাধা প্রদান কবা, আর এক শক্তির কার্য। এক শক্তি সুখদায়ক ও আর এক শক্তি সুখের প্রতিরোধ করিয়া থাকে।

মানুষের জীবন সুখদুঃখময়, কিন্তু মানুষ চায় সুখ, দুঃখ চায় না। দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টাই জীবন। দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইলেই সুখ হয়। এই সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, সুখ বলিয়া কিছু নাই। আমরা দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করি, চেষ্টার ফলে দুঃখের অবসানের অবস্থাই সুখ। কেহ বা অনুমান করেন, সুখের যেখানে বাধা সেইখানেই দুঃখ। আবার কেহ কেহ বলেন, সুখ দুঃখে কোন প্রভেদ নাই; সুখ ব্যতীত দুঃখের ও দুঃখ ব্যতীত সুখের অনুভূতি হইতে পারে না, সুতরাং সুখ দুঃখকে ছাড়িয়া থাকে না, দুঃখও সুখকে ছাড়িয়া থাকে না। উহারা উভয়েই মূলে এক জিনিস। সুখের চেষ্টায় ঘুরিয়া আমরা সুখকে পাই না, দুঃখ সুখের চিরসঙ্গী।

প্রাচীনকালের মানুষ শক্তিমাত্রকেই দেবতা জ্ঞান করিত। তাহারা সুখের শক্তি ও দুঃখের শক্তি অনুভব করিত। সুতরাং সুখদায়ক ও দুঃখদায়ক উভয়বিধ দেবতা তাহারা কল্পনা করিত। দুঃখের অবসানে সুখ আপনিই আসিয়া পড়ে, সুতরাং দুঃখদায়ক দেবতাকেই স্বভাবত তাহারা তুষ্ট করিবার বেশি চেষ্টা করিত। অনেকের মনে ধারণা, দেবতা ও ঈশ্বরের ভাব মানুষের মনে প্রথমে এইভাবে আসিয়াছিল। পশু-পক্ষীও মানুষের মত সুখদুঃখময় জীবন বহন করে। তাহারাও সুখের চেষ্টায় ঘোরে, দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইতে চায়, কিন্তু তাহাদের বিচারশক্তি ও কল্পনাশক্তি নাই; তাই তাহারা সুখদুঃখময় সংসারের ভিতর হইতে দেবতা বা ঈশ্বরকে বাছিয়া বাহির করিতে পারে না! দুঃখ ও বিপদ্ মূর্তিমান্ হইয়া মানবের সম্মুখবর্তী হইলে, মানব ভয়ে তাহাদিগকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের হাত এড়াইবার জন্য তাহাদিগের তুষ্টির চেষ্টাই তাহাদিগের পূজা। আমরা মানবসমাজে ইহার লক্ষণ এখনও দেখিতে পাই। মানব শনির পূজা করে, শীতলার পূজা করে, ষষ্ঠীর পূজা করে, অলক্ষ্মীর পূজা করে, আরও কত দুঃখদায়ক দেবদেবীর পূজা করে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আপাতত মনে হয়, মানুষ প্রথমে দেবতাদিগকে ভয়েই ভজে, ভক্তিতে নয়। কিন্তু আমরা মানবজাতির ইতিহাস আরও ভাল করিয়া দেখিলে আমাদের অন্যরূপ মনে হয়। সকল মানবজাতিই প্রাচীন কাল হইতে, সর্বশক্তিমান্, পরমমঙ্গলপ্রদ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে; সকল মানবজাতিই পরকালে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। অন্তত ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাস মানব বরাবরই করিয়া আসিতেছে। পরকালের বিশ্বাসের সঙ্গে ভয়ে-ভজার সঙ্গতি থাকিতে পারে না। মানুষ বিচারের আশা না করিয়া, পরকালের ধারণা করিতে পারে না। বঙ্গদেশের ইতিহাসে দেখিতে পাই, বাঙ্গালীরা এক সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত, কিন্তু তাহারা পূজা করিত দুঃখদায়ক দেবতাগণকে। পাহাড়ের উপরে, বনে ব্যাঘ্রাদি

হিংস্র জন্তুর ভয়, সুতরাং তাহারা বনকে, পাহাড়কে পূজা করিতে বাধ্য হইত ; নদীতে হাঙ্গর কুমীরের ভয়, ডুবিয়া মরার ভয়, সুতরাং নদীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাহারা ছাগ ও মেষ নদীর জলে নিক্ষেপ করিত।

ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আমি আছি, এই জ্ঞান মানুষের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বর আছেন, সেই জ্ঞানও তাহার পক্ষে সেইরূপ স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে মানুষের এই দুই জ্ঞানের প্রথম প্রথম কিছু ব্যতিক্রম হয়। মানুষের মনে কোন্ সময় প্রথম মৃত্যুচিন্তা আসিয়া উপনীত হইল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু মানুষ চিরকালই মরিতে চায় না। চৈতন্যের একেবারে বিলোপই মৃত্যু ; যতক্ষণ চৈতন্য আছে, ততক্ষণ কাহাকেও মৃত বলা যায় না। এই চৈতন্যের একেবারে বিলোপ হয়, মানুষ এই ভাব কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। মৃত্যুচিন্তা মানুষকে বড়ই বিহ্বল করিয়া ফেলে। যদি আশা না থাকিত, মানুষের জীবন দুর্বহ হইয়া পড়িত। মানুষ আশা করে মৃত্যু প্রতীয়মান, মৃত্যু প্রকৃত নহে। বিহ্বল হইলেই আশার বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। মানুষ বিহ্বল হয় বলিয়াই আশা করে পরকাল আছে। জগৎ বড়ই বৈচিত্র্যময়, বড়ই কৌশলে রচিত ; আমরা দেখিতে পাই, যেখানে যেটুকু দরকার, জগতের সেখানে সেটুকু আছে। আশা মানুষের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, ইতর জীব আশার বাণী শুনিতে পায় না। মানুষের জীবনের সঙ্গে আশার এইরূপ সম্বন্ধ যে, আশার সহিত এক মুহূর্তের বিচ্ছেদও মানুষ সহিতে পারে না। মানুষের যে পরকাল আছে আশাই তাহা প্রথমে মানুষের কানে কানে বলিয়া দেয়। মানুষ আপনার মনকে প্রবোধ না দিয়া থাকিতে পারে না, মানুষের স্বভাবই এই।

মানুষ যখন প্রবলের দ্বারা অন্যায়ভাবে পীড়িত হয়, তখন মানুষ আশা করে, একজন ইহার বিচার করিবে। অনন্তের পিপাসা বরাবরই মানুষের মধ্যে অনুস্যূত আছে। পরকাল ও ঈশ্বরের ধারণা, এই পিপাসাই মানুষকে আনিয়া দিয়াছে। ঈশ্বর যে দিন মানুষকে সৃষ্টি করিলেন, সেই দিন পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা মানুষের মনে গ্রথিত করিয়া দিলেন।

আধুনিক বিজ্ঞানকেই আমরা বিজ্ঞান বলিয়া মানি, কিন্তু বিজ্ঞান কত কালের তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যত কালের, বিজ্ঞানও ততকালের। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যাহা পর্যবেক্ষণ করে, তাহা হইতে সে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহাই তাহার বিজ্ঞান। বুদ্ধিবৃত্তি যত পরিপক্বতা লাভ করে, বিজ্ঞানও তত উন্নত হয়। এক সময় মানুষ যাহার চাঞ্চল্য দেখিত তাহারই প্রাণ আছে বলিয়া মনে করিত। তখন মানুষের কাছে বায়ুর চৈতন্য ছিল ; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহনক্ষত্রাদিরও চৈতন্য ছিল। তখন মানুষের মনের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার বিজ্ঞানেরও সেইরূপ অবস্থা ছিল। এখন মানুষের

মনের অবস্থার সহিত বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তখন বিজ্ঞান ছিল না, এখন বিজ্ঞান হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে গিয়া, মানুষ ঈশ্বর হইতে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে।

লোকে বলে আশা মায়াবিনী। আশা মানুষকে প্রবঞ্চনা করে, সত্য কথা বলে না। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তিনি মানুষকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য দেন নাই। ঈশ্বর মানুষকে যাহা দিয়াছেন, মানুষ তাহার অযথা ব্যবহার করে বলিয়াই, মানুষ আপনিই প্রবঞ্চিত হয়। আশা মানব-মনের এমন একটা কিছু, যাহা মানব-মন হইতে বাদ দিলে মানব মরিয়া যায়। এমন যে জিনিস তাহা কখনই বৃথা সৃষ্ট হয় নাই। মানব-মনে আশার কার্য আছে ও কার্যের সার্থকতা আছে। পরকাল ও ঈশ্বরের ধারণার জন্যই আশা সৃষ্ট হইয়াছে। আশার আর কোন কাজ নাই।

আমরা আশাকে টানিয়া যখন অন্য দিকে লইয়া যাই, তখনই প্রবঞ্চিত হই। একের কাজ অন্যের দ্বারা হইতে পারে না। মানুষ সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে, যদি তাহার ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস থাকে। এই জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসারে, এই অত্যাচার ও মৃত্যুভয়-প্রপীড়িত জগতে, আশাকে বক্ষে ধারণ না করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। কে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যে জীবন ধারণ করিয়াছে? যখন পূর্ণ নৈরাশ্যের উদয় হয়, তখন হয় মানুষ পাগল হইয়া যায়, না হয় সে ঈশ্বরের উপরে আত্মসমর্পণ করে। পূর্ণ নৈরাশ্যে ঈশ্বর-চিন্তা ব্যতীত মানুষ ঠিক থাকিতে পারে, এমন দেখা যায় না। সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাহারও শোকে, হয় মানুষ আশায় বাঁচিয়া থাকে, না হয় পাগল হইয়া যায়, না হয় অন্য চিন্তায় শোক প্রশমিত করে।

দেখা গিয়াছে, অত্যন্ত প্রিয়তমের মুমূর্ষু অবস্থা, তথাপি লোক আশা করিতেছে, বাঁচিতে পারে; কিন্তু যেই তাহার আশার অবসান হইবার সময় হয়, সে হয় ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়ে. না হয়, অন্তত কিছু কালের জন্য পাগল হইয়া যায়, পূর্ণ নৈরাশ্যের অবস্থায় মানুষ বাঁচিতে পারে না;—তাই প্রকৃতির কৌশলে এইরূপ হয়। যাঁহারা পরকাল বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসবান্, তাঁহাদের এইরূপ হইতে দেখা যায় না।

আমরা ন্যায়-সঙ্গত আশা রাখি, পরকাল আছে, ঈশ্বরের বিচার আছে, তাহা না হইলে কে এ তুচ্ছ জীবন রাখিতে পারিত? ভয় হইতে, দুঃখ হইতে, মানব-মনে ঈশ্বরের ধারণা আসিয়াছে, ইহা অত্যন্ত কাঁচা কথা। মানব-মনের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস না থাকিলে, পৃথিবীর কোন ঘটনাই তাহা আনিতে পারে না। ঈশ্বর মানব-মনের অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন, তাই মানব-মন তাঁহাকে খুঁজিয়া পায়।

পৃথিবীর সকল জাতিই পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ। মানব যুক্তি অবলম্বন করিতে গিয়া সেই বিশ্বাসকে কতক পরিমাণে হারাইয়া ফেলিতে পারে। মানুষ যখন

প্রাকৃতিক শক্তিসকলের সহিত সংঘর্ষে আসিল, সীমাবদ্ধ বুদ্ধি লইয়া যখন মনে করিল, ইহারা চৈতন্যময়, ঈশ্বরের স্বরূপ তখন মানুষের নিকটে খাট হইয়া পড়িল। মানুষ মনে করিল, ঈশ্বর তাহারই মত প্রকৃতি-বিশিষ্ট।

আমরা যে ভাবে ইতিহাস আলোচনা করি, তাহাতে আপাতত মনে হয়, মানব বুঝি সর্বপ্রথমে প্রাকৃতিক শক্তিসকলকে, এক-একটি ঈশ্বর বলিয়া মনে ধারণা করিত। তাহাদের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ ধারণা ছিল না, প্রাকৃতিক যে শক্তি তাহাদিগকে নির্যাতন করিত, তাহারা তাহাকেই পূজার দ্বারা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিত। ঈশ্বরের ধারণা যদি মানুষের মনে এই ভাবেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর অলীক কল্পনা বই আর কিছুই নয়।

কিন্তু ঈশ্বর অলীক কল্পনা নহেন, তিনি জীবন্ত সত্য। আত্মার সহিত সত্যের সম্বন্ধ নিত্য ও স্বাভাবিক। মানবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ মিথ্যার ভিতর দিয়া হয় নাই যেমন, আত্মা স্বভাবত জানে, তাহার মৃত্যু নাই। মৃত্যুর ধারণা মানুষের সংস্কার মাত্র। মানুষের আত্মার মূলে মৃত্যুর ধারণা নাই। অভিজ্ঞতার দ্বারা মৃত্যুর ধারণা মানুষ সংগ্রহ করে। যখন মানুষ অন্য শরীরকে নিস্পন্দ হইতে দেখে, তখন সে মনে করে, কোন জীব মরিল। পুনঃপুনঃ এইরূপ দেখিয়া তাহার ধারণা হইল জীবমাত্রেই মরে। সেও একজন জীব, সুতরাং সেও মরিবে। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সাধ্য মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের নাই।

আত্মা স্বভাবত অবিনশ্বর, সুতরাং মৃত্যুর ধারণা আত্মার পক্ষে বিসদৃশ সংস্কার। মানুষ ইহা সহ্য করিতে পারে না। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করিবার সময়, মানুষের জন্য আশার সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ সেই আশায় বুক বাঁধিয়া জীবনধারণ করিতেছে।

যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরে সুখের উপাসনায় মানুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সুখ নানাপ্রকার, দুঃখও নানাপ্রকার। সুখ দুঃখের প্রবর্তক, সুতরাং এক নহে, বহু। ইহাই তৃতীয় স্তরের সিদ্ধান্ত। বেদের সংহিতাভাগ এই স্তরের অন্তর্গত। এই স্তরে শক্তির রূপকল্পনা প্রায় দেখা যায় না; কিন্তু শক্তিসকল অনুভূত ও নানা নামে অভিহিত হয়। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এবং সুখ লাভ করিবার জন্য, স্তবস্তুতির আবির্ভাব হয়। সংহিতা-ভাগের মন্ত্রসকল এই স্তবস্তুতি। শক্তির অনুভূতি সহজে হয় না। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাযুক্ত হৃদয়েই শক্তির অনুভূতি হয়। শক্তি-অনুভূতির পূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হইলে, শব্দের সাহায্যে তাহার মন্ত্ররূপে স্ফুরণ হয়। হিন্দুশাস্ত্র-মতে শব্দই ব্রহ্ম। শব্দ-ব্রহ্ম হইতে মন্ত্রের উৎপত্তি। যে শক্তি অনুভূত হয়, মন্ত্রে তাহার অভিব্যক্তি হয়।

শক্তির অনুভূতি যখন অস্পষ্ট অবস্থায় ছিল, সূক্ষ্ম ও অস্পষ্টভাবে শক্তির ধারণা

যখন হয় নাই, তখন এই সকল শক্তির নাম, রূপ ও মূর্তি কল্পনা ও তাহাদিগের পূজা হইত। আদি ধর্মবিশ্বাস এই স্তরের।

ক্রমশ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচারের দ্বারা এই বিবিধ শক্তি যে একেরই বিকাশ, ইহা অনুভূত হয়। এক আদ্যাশক্তি আছেন, তাঁহারই অসংখ্য বিভূতি। তখন অনুভূত হয় 'এইরূপ সৎ'—আর ইহাতে 'বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। এইরূপে অনুলোম বিলোম বিচারে এক হইতে বহুত্বের ও বহুত্ব হইতে একত্বের অনুভূতি হয়। স্থূলাবস্থায় একেশ্বরবাদ ; সূক্ষ্মাবস্থায় ইহাই ব্রহ্মানুভূতি। স্থূল একেশ্বরবাদ পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিরাট অসীমত্ব মানবের মধ্যে অনুস্যূত থাকিলেও অসীমের ধারণা সাধারণ ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে সু-কর নহে। অসীম ও নিরাকার ব্রহ্মকে সে ধারণায় আনিতে পারে না। যাহাকে ধারণায় আনিতে পারা যায় না, তাহার স্তবস্তুতিও হইতে পারে না ; সুতরাং সাধারণ মানবের জন্য মূর্তিকল্পনার প্রয়োজন হয়। মহাপ্রাণ মহর্ষিগণ সাধারণের উপকারের জন্য এইরূপ মূর্তি-কল্পনা করিলেন, তাহা পূজা ও উপাসনার যোগ্য হইল।

মানুষ মরিলে সব ফুরায় না। দেহের নাশ হয়, কিন্তু আত্মা থাকে। সকল দেশের মানব-জাতির বরাবর এই বিশ্বাস। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, কেহই একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না, তাঁহারা স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্ম জগতে চলিয়া যান মাত্র। এখানে তাঁহারা থাকিলে, আমরা তাঁহাদিগকে কত যত্ন করি। কিন্তু তাঁহারা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে, সম্বন্ধ একেবারে যায় না। তাঁহারা পরলোকে আমাদের সেবা ও জলপ্রার্থী। আমরা তাঁহাদের সেবার ত্রুটি করিলে, তাঁহারা অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইতে পারেন, ও আমাদের অমঙ্গল-বিধান করিতে পারেন। এখানেও সুখেচ্ছা ও দুঃখ-পরিহারেচ্ছার ভাব আসিয়া প্রভাব বিস্তার করে। পরলোকগত পূর্বপুরুষেরা রুষ্ট হইলে অমঙ্গল ও তুষ্ট হইলে মঙ্গল বিধান করিতে পারেন ; সুতরাং পূজার দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তোষ বিধানের প্রয়োজন হয়। প্রেতাত্মাকে ধ্যানে আহ্বান করিয়া পূজা করিতে হয়, স্থূল জগতের অন্তরালে এক সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্বের বিশ্বাস অতি আদিম অবস্থা হইতে মানবের আছে। এই বিশ্বাসই পরকালে, স্বর্গ ও নরক-বিশ্বাসের মূলীভূত কারণ।

ঈশ্বর হইতে ছোট এবং মানুষ হইতে বড় কিছুর কল্পনায় দেবতার আবির্ভাব। জগতের সকল জাতিই কোন না কোন আকারে দেবতার কল্পনা করিয়াছে। এই দেব-কল্পনার আভাস আমরা পূর্বে দিয়াছি। মানুষ অজ্ঞতাবশতঃই যে দেবতার পূজা করে একথা বলিলে চলিবে না। যখন পৃথিবীর সকল জাতিই দেবতায় বিশ্বাস করে তখন বিষয়টিকে এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এ বিষয়ের আলোচনার আবশ্যকতা আছে। দেবতত্ত্বের আলোচনায় দেবতাদের কি কার্য তাহা বুঝিতে হইবে।

হিন্দুশাস্ত্রে দেবতার নাম আছে, তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ আছে, তাঁহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে, তাঁহারা নির্দিষ্ট স্থানে বাস করেন। প্রত্যেক দেবতার বৈশিষ্ট্য শাস্ত্র লিপিবন্ধ করিয়াছে। এই যে দেবতা ইঁহাদের কোন মূর্তি আছে কি না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহারা কোন প্রাকৃত দেহ ধারণ করেন না। তবে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবতা যে লোকের উপাদানের অনুরূপ, মূর্তি সেই দেবতার সেইরূপ হইয়া থাকে। বেদে এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহাতে দেবতার মূর্তি সূচিত হইয়াছে। বেদান্তও দেবতার মূর্তির কথা বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যে ইন্দ্র-দেবতা-সম্পর্কে বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রনামা কশ্চিদ্ বিগ্রহবান্ দেবঃ" (১।২।২৯)। আবার তিনি ৩।১।২৭ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, দেবতারা একই সময়ে বহু মূর্তিতে কায়ব্যূহ সৃষ্টি করিয়া প্রকটিত হইয়া থাকেন। দেবতাদের নিজেদের প্রিয় মূর্তি আছে, তবে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন মূর্তি ধারণ করিতে পারেন। এইজন্য আমারা দেখিতে পাই—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপমীয়তে।" জৈমিনি মীমাংসা-দর্শনে বলিয়াছেন, "মন্ত্রাত্মিকা দেবতা"। যে দেবতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আরাধনা করা যায়, দেবতা সেই মন্ত্রের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। মূর্তির অস্তিত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাণিনি অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ। আজকাল পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনি অন্তত খ্রীঃ-পূঃ ৮ম শতকে বর্তমান ছিলেন। পাণিনি (৫।৩।৯৯) একটি সূত্র করিয়াছেন—তাহার অর্থ এই যে, অবিক্রেয় যে 'প্রতিকৃতি,' যাহা কেবল জীবিকার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাতে 'কন্' প্রত্যয় হয় না। প্রতিকৃতি শব্দের অর্থ—যাহা কোন মূল মূর্তির আদর্শ। ভাষ্যকারগণ ইহাকে মূর্তি বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা ইহতে প্রমাণিত হইতেছে যে, পাণিনির সময়ে দেবদেবীর মূর্তি ছিল। এ সমস্ত মূর্তি বাজারে বিক্রয় করা হইত না। তবে জীবিকার্থে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এই মূর্তিগুলির অধিকারী মূর্তিগুলি নিজের কাছে রাখিয়া, অপরকে প্রদর্শন করিয়া, ভিক্ষাস্বরূপ যাহা পাইত, তদ্দ্বারাই নিজের খরচ চালাইত।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট হইতেছে ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ। ইহার ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত-ব্রাহ্মণ। ইহাতে হাস্যকারী, রোদনশীল, নৃত্যকারী দেবমূর্তির উল্লেখ আছে। এত প্রাচীনকালের মূর্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মত একরূপ নয়। অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মূলর লিখিয়াছেন—"The religion of the Veda knows no idols. The worship of idols in India is a secondary formation, a later degeneration of the more primitive Worship of the ideal gods." (Chips from a German Workshop, Vol. I, p. 35)। ডক্টর বোলেনসেন (Z.D.M.G. Vol. XXII, p. 587) কিন্তু বৈদিক কালে

মূর্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"From the common appelation of the gods as দিবো নরঃ "Men of the sky" or simply নর (later) "Men," and from the epithet "নৃপেসঃ" having the form of Men, R. V, III. 4. 5, we may conclude that the Indians did not merely in imagination assign human forms to their gods, but also represented them in a sensible manner."

যাস্কের সময় মূর্তি যে খুব বেশি প্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহার নিরুক্ত-পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিরুক্তে তিনি বলিয়াছেন,—"এখন আমাদের দেবতাদের মূর্তি বিচার করিতে হইবে। সংহিতাতে দেবগণ এক হিসাবে নরাকৃতি। বুদ্ধিমান্ বলিয়া দেবতাদের সম্বোধন ও প্রশংসা করা হয়। দেবগণ মানবের ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পর পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বিশেষ প্রচলিত মূর্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—শিব, স্কন্দ, বিশাখমূর্তি—শিব, স্কন্দ, বিশাখ বলিয়াই উক্ত হইবে, শিবক, স্কন্দক, বিশাখক হইবে না। রামায়ণ-যুগে যে দেবমূর্তি দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ লঙ্কায় মন্দিরের উল্লেখ—৬।৩৯।২১। লঙ্কার প্রতিমা সম্বন্ধে উল্লেখ আর এক জায়গায় আছে—প্রতিমাশ্চ প্রকম্পতে স্বিদন্তি হসন্তি চ (৬।১১।২৮)।

মহাভারতে দেবমূর্তির যথেষ্ট উল্লেখ আছে। যেমন হস্তী, অশ্ব, মানব প্রভৃতির প্রস্তরমূর্তির উল্লেখ আছে, তেমনই তীর্থে দেবমূর্তিরও যথেষ্ট উল্লেখ আছে। বনপর্বে আছে, জ্যেষ্ঠীলা দেবীর সহিত বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে মিত্র ও বরুণলোক লাভ হয়। ইহাতে মূর্তি ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। অন্যত্র (১৩।২১।৬১) আছে—শিব-মূর্তি দর্শনে লোকে পাপমুক্ত হয়—"নন্দীশ্বরস্য মূর্তিং তু দৃষ্ট্বা মুচ্যেত কিল্বিষৈঃ।" ধর্ম-গ্রন্থ ধর্মতীর্থে আছে—

"তত্র ধর্মো নিত্যং আস্তে"—ধর্ম সেখানে নিত্য উপবেশন করিয়া থাকেন। 'ধর্মং তত্রাভিসংস্পৃশ্য'—ধর্মকে অভিসংস্পর্শ করিয়া—সম্ভবত স্নান করাইয়া। হরিবংশে ধাতু, মৃত্তিকা, দারু নবনীত ও লবণ-নির্মিত মূর্তির উল্লেখ আছে।

যাহারা মূর্তি নির্মাণ করে এবং বহন করিয়া থাকে মহাভারত ও মনুসংহিতার তাহাদের নাম দিয়াছেন—দেবলক। এছাড়া মন্দির, চৈত্যের ভূরি ভূরি উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারতে আছে। কয়েকটি উদাহরণ এই—

"দেবায়তনানি"—রামায়ণ ২।২৬।৩৩

"শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ"—২।৬।৪

"দেবাগারাণি শূন্যানি ন চ ভান্তি যথাপুরম্"—২।৭১।৩৯

"দেবায়তনস্থা দেবাঃ"—৬।১১২।১১

দক্ষিণ-ভারতে এ পর্যন্ত যতগুলি হিন্দু-স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শন হইতেছে, গুডিমল্লম্ নামক স্থানের লিঙ্গমূর্তি। মূর্তি-

তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার অলঙ্কার প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ইহা ভারহুত স্থাপত্য-যুগের নিদর্শন। খ্রীঃ-পূঃ দ্বিতীয় শতকে যে লিঙ্গ-পূজা হইত, ইহা তাহার একটি প্রমাণ। সম্প্রতি বেসনগরে গরুড়স্তম্ভের উপর একখানি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে ক্ষোদিত আছে যে, Dionএর পুত্র Heliodoros একজন ভাগবত ছিলেন। ইনি গ্রীকরাজ Antalkidasএর রাজত্বকালে তক্ষশিলা হইতে আনিয়া বাসুদেবের গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ করান। Antalkidasএর সময় ১৭৫ হইতে ১৩৫ খ্রীঃ-পূঃ। শিলালিপিতে বিষ্ণু এই প্রথম বাসুদেব-আখ্যায় উল্লিখিত। ইহা হইতে স্থির করিতে পারা যায় যে, বাসুদেবের পূজা খ্রীঃ-পূঃ দ্বিতীয় শতকেও হইত।

দেবতত্ত্বের মুখবন্ধে আজ আমরা বেশি কিছু বলিব না। ইহার পর আমরা দেবতত্ত্বের এক-একটি বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করিব। স্তর-ভেদে দেবতত্ত্বের যুগভেদ আছে। বেদে আমরা কতকগুলি দেবতা দেখিতে পাই। সাধারণত লোকের ধারণা, সেই দেবতাগুলি সমস্তই ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত। বৈদিক দেবতা পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। আর্যগণ ভারতে আগমন করিবার পূর্বে তাহারা যে সমস্ত দেবতার পূজা করিত, ভারতে আসিয়া তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মর্যাদার কিছু কিছু অবস্থান্তর ঘটে। সেই সমস্ত দেবতা বৈদিক যুগের পূর্বে, বৈদিক যুগে এবং পর যুগে কিরূপ অবস্থা লাভ করে, দেবতত্ত্বের তাহারও একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। বৈদিক যুগের পূর্বে কয়েকটি প্রধান দেবতা ছিল। বৈদিকযুগে আসিয়া তাহাদের নামে পরিবর্তিত হইল না বটে, কিন্তু কার্যত তাহাদের ঘোর পরিবর্তন ঘটে। বৈদিক যুগে যে সমস্ত দেবতা পূজিত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দেবতাকে লোকে পরযুগে একেবারে ভুলিয়া গেল। যাহারা রহিল তাহাদের মর্যাদার অনেক খানিকটারই হানি হইল। হইবার কারণ—বৈদিক যুগে লোকে যাগযজ্ঞ লইয়া এত মাতিয়াছিল যে দেবতার মধ্যে অনেকের খোঁজখবর লইবার অবকাশ জুটিত না। যে সমস্ত দেবতাদের তাহারা ভুলিল না, তাহাদের মধ্যে কয়েকটির মর্যাদা খুব বাড়িয়া উঠিল। এ ছাড়া আর একটি নূতন ব্যাপার সংঘটিত হইল। কয়েকটি নূতন দেবতা আসিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের গণ্ডিতে আশ্রয় লাভ করিল। বৈদিক দেবতাদের অধিকাংশেরই পূজা বন্ধ হইল, তাহারা শুধু নামেই বড় রহিল। এই সময়ে দেবতারা ক্রমশ এক-একটা কর্মকাণ্ডের বিভাগ জুড়িয়া বসিতে লাগিলেন। ঋগ্বেদের সময় যে সব দেবের যে বিষয়ে সামান্য সম্বন্ধ ছিল, অথবা কিছুই সম্পর্ক ছিল না, এখন হইতে তাহারা নির্দিষ্ট কার্যে অধিকারী হইয়া দাঁড়াইলেন। ঋগ্বেদের সময় বরুণের জলের সঙ্গে কচিৎ সম্পর্ক ছিল, কিন্তু এখন তিনি সমুদ্রের দেবতা হইলেন। বৈদিক সবিতা ঠিক সূর্যের দেবতা নন। কিন্তু পরে তিনি সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। সোম আদৌ ঋগ্বেদে চন্দ্রদেব ছিলেন না, কিন্তু পরে তিনি ঐ পদের অধিকারী হন। যমও কোথা হইতে হঠাৎ মৃত্যুলোকের অধিপতি হইয়া বসিলেন।

বিষ্ণু, প্রজাপতি ও রুদ্রের সঙ্গে যে সমস্ত বৈদিক দেবতা ব্রাহ্মণ্যযুগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের নাম অগ্নি, সবিতা, সোম, বসু, বরুণ, যম এবং অশ্বি-দ্বয়।

বেদের পরবর্তী যুগে কুমার, গণেশ, কুবের বা বৈশ্রবণ, কাম প্রভৃতি কয়েকজন বড় বড় দেব হইয়াছিলেন। দেবীদিগের মধ্যে লক্ষ্মী বা শ্রী, সরস্বতী ও গঙ্গার নাম উল্লেখ্য। এছাড়া সূর্য-পত্নী সংজ্ঞা, ইন্দ্র-পত্নী শচী প্রভৃতি তো আছেনই।

দেবতত্ত্বে অসুর, দৈত্য, দানব, নাগ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতিরও আলোচনা থাকিবে। আর একশ্রেণীর দেবতা আছেন যাঁহাদের বিষয় বিশেষভাবে আলোচ্য। তাঁহারা নরত্ব হইতে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন।

দেব শব্দের নিরুক্তি

দেবতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথমে বুঝিতে হইবে—দেব বা দেবতা শব্দের অর্থ বা নিরুক্তি কি? আমরা দেবতার পূজা, অর্চনা করিয়া থাকি, দেবতা বলিতেও একটা কিছু বুঝি, কিন্তু এখন যাহা বুঝি, বরাবর হয়তো তাহা বুঝিতাম না, আর বুঝিলেও বোঝার মধ্যে অনেক তারতম্য রহিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুর নিকট বেদ স্বতঃপ্রমাণ, আর বেদের মন্ত্র হিন্দুর সকল প্রমাণের প্রমাণ। শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, যদি বেদের মন্ত্র বুঝিতে চাও, সর্বাগ্রেই তোমাকে মন্ত্রের ঋষি, দেবতা ও ছন্দ বুঝিতে হইবে; তাহা না বুঝিযা বেদ-মন্ত্র পাঠ করিলে, স্মরণ করিলে, জপ করিলে, হোম যজ্ঞ, বা যজন করিলে তোমাকে পাপভাগী হইতে হইবে। সেই জন্যই মহর্ষি কাত্যায়ন আদেশ করিয়াছেন—

"এতান্যবিদিত্বা যোঽধীতেঽনুব্রূতে জপতি জুহোতি যজতে যাজতে তস্য ব্রহ্ম নির্বীর্যং যাতযামং ভবতি।"—শুক্লযজুঃ-সর্বানুক্রমসূত্র।

বৃহদ্দেবতাকার শৌনক ঋষিও বলিয়াছেন, মন্ত্রের দেবতাকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে; যিনি দেবতাকে জানেন, তিনিই মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া থাকেন। দেবতাকে ঠিক না বুঝিলে কেহ বৈদিক বা লৌকিক কর্মের ফল পায় না।

'বেদিতব্যং দৈবতং হি মন্ত্রে মন্ত্রে প্রযত্নতঃ।
দৈবতজ্ঞো হি মন্ত্রাণাং তদর্থমধিগচ্ছতি॥ ২

*　　*　　*

ন হি কশ্চিদবিজ্ঞায় যাথাতথ্যেন দৈবতম্।
লৌকিকানাং বৈদিকানাং কর্মণাং ফলমশ্নুতে॥" ৪

—বৃহদ্দেবতা, প্রথমাধ্যায়।

মহর্ষি কাত্যায়ন ঋক্-সংহিতার অনুক্রমণিকায় এই ঋষি ও দেবতা বলিলে কি বুঝায় তাহার আভাস দিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন,—যাঁহার বাক্য, তিনি ঋষি। তিনি যাহা বলেন, তাহা দেবতা। সেই বাক্যে যে বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে, তাহাও দেবতা।

"যস্য বাক্যং স ঋষিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।
তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং যদ্বস্তু সা দেবতা॥"

এই বাক্যে দেবতা-বস্তুর ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু দেবতার ভিতর-বাহিরের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। বেদে দেবতার কথা আছে, কিন্তু বৈদিক ঋষিগণের দেব সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা বুঝাইবার মত কোন ঋক্ বেদে নাই, তবে বৈদিক সম্প্রদায়বিদ্‌গণের জ্ঞান-পারম্পর্যের ধারা নিরুক্তকারের সময়েও একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। প্রবচনপরম্পরায় নিরুক্তকার যাস্কের সময়েও ক্ষীণ রেখায় সেই ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। নিরুক্তকার যাস্ক কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। তবে প্রত্নতত্ত্বের অনুগ্রহে এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, যাস্ক আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, সেই সুপ্রাচীন কালে যাস্ক নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে [৭ম অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ২য় খণ্ড (১৫)] দেব-শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ঃ

"……………দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো
ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা………"

মহর্ষি পাণিনির ব্যাকরণের অনেক ভাষ্যকার আছেন। কিন্তু যাস্করচিত নিরুক্তের ভাষ্যকার অতি অল্প।

উগ্র, স্কন্দস্বামী দেবরাজযজ্বা, দুর্গ প্রভৃতি কয়েকজন নিরুক্তভাষ্যকার আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অত্রিগোত্র দেবরাজযজ্বা ও দুর্গাচার্যের ভাষ্যই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দেবরাজ যজ্বা যাস্ক-লিখিত নিঘণ্টুর নির্বচন-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই বচনের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন—ঐশ্বর্য দান করেন বলিয়া অথবা তেজোময়ত্ব হেতু "দেব" এই নাম হইয়াছে। এইরূপ যে দেব দ্যু-স্থানস্থ হ'ন, তিনি দেবতা। অন্যত্র (পঞ্চামাধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ডে) ইঁনি যাস্কের দেব শব্দের এইরূপ অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন—

'দিব্যতি দানার্থো দীপ্ত্যর্থো বা [পচাদ্যচ্ ৩. ৩. ১৩৪]' তাঁহার মতে দিব্ ধাতুর দুইটি অর্থ—একটি অর্থ দান, আর একটি দীপ্তি। দানার্থ দিব্ ধাতুনিষ্পন্ন দেবসংজ্ঞা বুঝাইতে তিনি বলিয়াছেন যে, ভক্তগণকে যিনি তাঁহাদের অভিমত দান করিয়া থাকেন, তিনিই 'দেব'—

"দাতারোঽভিমতানাং ভক্তেভ্যঃ"।

অতঃপর দেব শব্দের দীপ্ত্যর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তৈজসত্বাদ্দীপ্তা বা। দ্যুতের্বাপি বাহুলকাদ্রূপসিদ্ধি।" কুল্লুকভট্টও মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ১১১ শ্লোকের টীকায় ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

"দ্যোতনাদ্দেব"

ইহা ছাড়া দেবশব্দের তিনি আরও একটি অর্থ করিয়াছেন। দ্যুঃ বা অন্তরিক্ষ-

সম্বন্ধী যাঁহারা, তাঁহারা দেব—"দিবঃ সম্বন্ধিনো বা দেবাঃ। …"দ্যুস্থানা ইত্যর্থঃ"। এই দেবতার অর্থ "রশ্মি"। 'দেবা রশ্ময় উচ্যন্তে।' এই অর্থের সমর্থনসূচক ঋক্-সংহিতার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"দেবানাং ভদ্রা সুমতির্ঋজুয়তাম্" (১৷৬৷১৷৫৷২)

পাণিনি তাঁহার ধাতুপাঠে "দিব্" ধাতুর দশটি অর্থ দিয়াছেন—সেই দশটি অর্থ এই ঃ

১। ক্রীড়া, ২। বিজিগীষা ৩। ব্যবহার, ৪। দ্যুতি, ৫। স্তুতি,
৬। মোদ—হর্ষ, ৭। মদ, ৮। স্বপ্ন—নিদ্রা, ৯। কান্তি, ১০। গতি।

এই দশ প্রকার অর্থযুক্ত 'দিব্' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'দেব' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দেব ও দেবতা একই। 'দেব' শব্দের উত্তর 'তল' প্রত্যয় করিয়া 'দেবতা' শব্দ সাধিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পাণিনির সূত্র হইতেছে 'দেবাত্তল্' (৫৷৪৷২৭)।

আনন্দগিরি* শঙ্কর বিরচিত ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যের টীকায় "দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্‌গীথ মাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম্ ইতি (১৷২৷৯)" এই ছান্দোগ্য-বাক্যের 'দেব' শব্দের অর্থ বুঝাইতে পাণিনির দিব্ ধাতুর দশটি অর্থ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

"দিব্যতেদ্যোতনার্থো দিবু ক্রীড়াবিজিগীষাব্যবহারদ্যুতিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তি-গতিষ্বিতি দর্শনাত্তস্য চাজন্তস্য সতি গুণে কর্তরি যথোক্তরূপাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ।"

বৈদিক ঋষিগণ কোন্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 'দেব' শব্দ ঈরিত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার উপায় না থাকিলেও পাণিনির "দিব্" ধাতুর দশবিধ অর্থসাহায্যে 'মানবতত্ত্ব-কারের' ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, "যিনি ক্রীড়া করেন, যাঁহার লীলা-কৈবল্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ, যিনি অসুরগণের বিজিগীষু, পাপনাশক, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান, ব্যাবহারিক জগতে যিনি স্থাবর, জঙ্গম—নানারূপে ব্যবহৃত হয়েন, যিনি দ্যোতনস্বভাব, যাঁহার প্রকাশে নিখিল বস্তু প্রকাশমান, যিনি সকলের স্তুতিভাজন; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহারই গুণকীর্তন করে, যাঁহারই বিভূতি ঐশ্বর্য খ্যাপন করে, যিনি সর্বত্র গতিশীল, সর্বব্যাপক, যিনি জ্ঞানময়—চৈতন্যস্বরূপ, অখিলগতির যিনি লক্ষ্যস্থল, তিনি 'দেব'—তিনি 'দেবতা'।

যাস্ক, পাণিনি প্রভৃতির পর কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে, কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া দেবব্যঞ্জক ভাবেরও পরিবর্তন হইয়াছে। কোথাও বা পরম্পরাগত ভাবের প্রভাবে প্রাচীন অর্থ গৃহীত হইয়াছে; আবার কোন কোন স্থানে কোন কোন বিশেষ অর্থই

---

* আনন্দগিরির টীকায় 'দিব্' ধাতুর দশটি অর্থের সংবাদ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সাধু শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সান্ন্যাল মহাশয়ই তাঁহার প্রণীত "মানবতত্ত্ব" গ্রন্থে (৪১০ পৃঃ) প্রথম প্রদান করেন।

প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আট শত বৎসর পূর্বে সায়ণাচার্য ঋগ্বেদানুক্রমণীতে বলিয়াছেন, দেবনার্থ 'দিব্' ধাতু হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; এই জন্যই 'দেব' এইরূপ বলা হইয়া থাকে। দেবন (ক্রীড়া) হেতু দেব হইয়াছে ; অতএব দেবগণের দেবত্ব।

"তথা দেবনার্থে দীব্যতি ধাতুনিমিত্তো দেব-শব্দ ইত্যেতদাম্নায়তে। দেবনাদ্বৈ দেবোঽভূদিতি—তদ্দেবানাং দেবত্বমিতি"।

ঋষি যাস্ক তাঁহার পূর্বাচার্যদিগের মতের অনুবর্তী হইয়া, দেবতাদের সংখ্যা একেবারে কমাইয়া তিন সংখ্যায় পরিণত করিয়াছেন। তিনি বলেন, দেবতা তিনটি, পৃথিবী-স্থান-দেবতা অগ্নি, অন্তরীক্ষ-স্থান-দেবতা বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুস্থান-দেবতা সূর্য।

দেবতার সংখ্যা

"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো. বায়ুর্বেন্দ্রোবান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থানঃ"—নিরুক্ত, ৭ম অধ্যায়, ২য় পাদ, ১ম খণ্ড (৫)।

নিরুক্তকারের এই উক্তির প্রমাণ-স্বরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৮ সূক্তের প্রথম ঋকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"সূর্যো নো দিবা পাতু বাতো অন্তরীক্ষাৎ।
অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ।"

মহাভাগ্যহেতু দেবতার একই আত্মা বহু প্রকারে স্তুত হয়। এই জন্যই ইঁহাদের বহু নাম "মহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি।"—নিরুক্ত ৭।২।১ (৫)।

এই ত্রিদেব ব্যতীত বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতার সংখ্যা ৩৩৩৯ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ক) "আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।"—ঋগ্বেদ, ১।৩৪।১১

(খ) "শ্রুষ্টীবানো হি দাশুষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ।
তানোহিদশ্ব গির্বণস্ত্রয়স্ত্রিংশতনা বহ।"—ঋক্ ১।৪৫।২

(গ) "যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ স্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিমৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্ ॥"
—ঋক্ ১।১৩৯।১১

(ঘ) "যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্।
বিদন্নহ দ্বিতাসনন্।"—ঋক্, ৮।২৮।১

(ঙ) "ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ।
মনোর্দেবা যজ্ঞিয়াসঃ।"—ঋক্, ৮।৩০।২

(চ) "বিশ্বৈর্দেবৈস্ত্রিভিরেকাদশৈরিহাদ্ভির্মরুদ্ভির্ভৃগুভিঃ সচাভুবা।"
—ঋক্, ৮।৩৫।৩

(ছ) "তব ত্যে সোম পবমান নিণ্যে বিশ্বে দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ।"—ঋক্, ৯।৯২।৪, শতপথব্রাহ্মণ—৪,৫,৭,২ এবং মহাভারত বনপর্ব ১৭২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১। ঋগ্বেদে ৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ—

"ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্।"—৩।৯ ৯

এ সম্বন্ধে শতপথব্রাহ্মণ—১১।৬।৩।৪ ও শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র—৮।২১।১৪ দ্রষ্টব্য।

বৃহদারণ্যক বা বাজসনেয় ব্রাহ্মণোপনিষদে (তৃতীয় অধ্যায় নবম ব্রাহ্মণ) দেবতার সংখ্যা লইয়া একটী আখ্যায়িকা আছে। এই আখ্যায়িকা হইতে একটি বিশেষ তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। ইহাতে দেবতার কথা যেরূপ আছে, আমরা তাহাই বলিতেছি।

বৈদগ্ধ শালক্য জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবতার সংখ্যা কত, যাজ্ঞবল্ক্য? তিনি উত্তর করিলেন,—৩০৩ এবং ৩০০৩।

ও! তাই—ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত?—তিনি বলিলেন—৩৩।

যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত?—তিনি বলিলেন—৬।

তাই নাকি? ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন—৩।

তাই বুঝি! ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত?—তিনি বলিলেন "দুই"।

সে কি? ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন—"দেড়"।

বেশ! ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন—"এক"।

৩০৩ এবং ৩০০৩ এই দেবতারা কাহারা? তিনি বলিলেন,—ইহারা দেবতাদিগের শক্তি। বস্তুত দেবতাদের সংখ্যা ৩৩।

ইহারা কাহারা?

তিনি বলিলেন—ইহারা অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, ইন্দ্র ও প্রজাপতি।*

বসু কাহারা—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আদিত্য, স্বর্গ, চন্দ্র ও নক্ষত্র।

রুদ্র কাহারা?—মানুষ ও দেবতার মধ্যে যে দশটি প্রাণ বায়ু, তাহাই রুদ্র।

আর আদিত্য? বৎসরের দ্বাদশ মাস।

ইন্দ্র ও প্রজাপতি কাহারা? ইন্দ্র—বজ্র—প্রজাপতি—গোগণ।

আপনি যে ছয় দেবতার কথা বলিলেন, তাঁহারা কে?—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য ও দ্যো।

বেশ, তিন দেবতা কাহারা?—এই তিন লোক, ইহাদের মধ্যেই সমস্ত দেব রহিয়াছেন।

আচ্ছা, দুই দেব কাহারা?—অন্ন ও প্রাণ?

এইবার বলুন, দেড় দেব কে?—যিনি এখানে পবমান হইতেছেন (অর্থাৎ বায়ু)।

এক দেব কে?—প্রাণ।

---

* শতপথ-ব্রাহ্মণেও (১১।৬।৩।৫) এই একই বাক্য পুনরুক্ত হইয়াছে—"কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশাদিত্যাষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাশ্চ একত্রিংশৎ ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশা ইতি।"

শতপথ-ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন যে, পূর্বেও দেবতার সংখ্যা যত ছিল, এখনও তাহাই আছে। সংখ্যার ইতরবিশেষ হয় নাই। এই ব্রাহ্মণে এক স্থানে আছে যে, তেত্রিশটি দেবতার একাদশটি স্বর্গে, একাদশটি পৃথিবীতে এবং একাদশটি জলে অবস্থিতি করেন। এই গ্রন্থের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, বসুগণ, রুদ্রগণ, ও আদিত্যগণ-ভেদে দেবতা ত্রিবিধ। আবার শতপথের অপর এক স্থানে ইহাদিগকে সপ্তবিধ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ ছাড়া এই গ্রন্থোদ্ধৃত ৩৩টি দেবতার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গৃহ্যসূত্রে ৩৩টি দেবকে ব্রহ্মাত্মজ বলা হইয়াছে। শতপথে উক্ত হইয়াছে যে. দেবতার সংখ্যা পরিবর্তিত হয় না। ত্রিলোকই যে ত্রিদেব, তাহা শতপথ-ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক মানিয়া লইয়াছেন।

ঐতরেয় আরণ্যক দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় কাণ্ডে দেবতাদের একটি বড় ফিরিস্তি দিয়াছেন, তাহার পরিচয় এইরূপ,—

ভূমা চিন্তা করিলেন,—"লোক-সমুদয়ে আমি লোকপাল প্রেরণ করিব।" অমনি জল হইতে পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। (৫)

তিনি পুরুষের উদ্দেশে ধ্যানস্থ হইলেন, অমনই ডিম্বের ন্যায় একটি মুখ বাহির হইল। অতঃপর মুখ হইতে বাক্, বাক্ হইতে অগ্নির প্রাদুর্ভাব হইল। তারপর নাসাছিদ্র উদ্ভূত হইল, তাহা হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে বায়ুর আবির্ভাব হইল।

এইরূপে ক্রমশ—

চক্ষু হইতে দৃষ্টি, তাহা হইতে আদিত্য
কর্ণ " শ্রবণ, " " দিক্
ত্বক্ " কেশ, " " বৃক্ষ, লতা
হৃদ্ " মন, " " চন্দ্রমা
নাভি " অপান, " " মৃত্যু
লিঙ্গ " বীর্য, " " জল

উদ্ভূত হইল।

অগ্নি ও ঐ সমস্ত দেবতা সৃষ্ট হইয়া মহাসমুদ্রে পতিত হইল। তখন পরমাত্মা ইহাদিগকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অভিভূত করিলেন। ১।

তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া পরমাত্মাকে বলিলেন, আমাদের অবস্থিতি ও আহারের জন্য আমাদিগকে একটি স্থান দিন।

তিনি প্রথমে গাবী, তারপর একটি গৃহ সমানয়ন করিলেন।

তাঁহারা তাহাতে পরিতুষ্ট হইলেন না। তখন তিনি মানুষকে তাঁহাদের নিকটে দিলেন, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—উত্তম। ২।

তিনি তখন প্রত্যেককে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট স্থানে যাইতে বলিলেন। ৩।

তখন অগ্নি	বাকরূপে	র মুখে	প্রবেশ করিলেন।
বায়ু	প্রাণরূপে	নাসিকাগহ্বরে	„
আদিত্য	দর্শনরূপে	চক্ষুতে	„
দিক্	শ্রবণরূপে	কর্ণে	„
বৃক্ষলতা	কেশরূপে	ত্বকে	„
চন্দ্রমা	মনোরূপে	হৃদয়ে	„
মৃত্যু	অপানরূপে	নাভিতে	„
জল	বীর্যরূপে	লিঙ্গে	„

তখন ক্ষুৎ-পিপাসা তাঁহার নিকট থাকিবার স্থান প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, 'ঐ সমস্ত দেবতাই তোমার স্থান, তাহাদের সহিত তোমরা সমস্ত ভোগ কর। ৫।

তারপর তিনি স্ত্রীগণকে নির্দিষ্টস্থানে যাইতে বলিলেন। ৬ অ—১ কাণ্ড—১।

তারপর দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া ধ্যান করি, তিনি কে? ২।

যাহা দ্বারা আমরা দেখি, শুনি, গন্ধ গ্রহণ করি, কথা কহি, মিষ্ট অমিষ্টের পার্থক্য করি, মন ও হৃদয় হইতে যাহা বাহির হয়, তাহা কি?

তিনি বলিলেন, এগুলি জ্ঞান বা আত্মার বিভিন্ন নাম মাত্র। ৪।

আর জ্ঞান-সম্বলিত সেই আত্মা—ব্রহ্ম। তাহাই ইন্দ্র, তাহাই প্রজাপতি। ৫।

এই সমস্ত দেবতা জ্ঞান বা আত্মা হইতে সম্ভূত।

আমরা ত্রিদেবের কথা পূর্বে বলিয়াছি। দেবতা তিনটি। অগ্নি পৃথিবীস্থান, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান এবং সূর্য দ্যুস্থান দেবতা। ইহার দ্বারা ত্রিদেবের লোক-বিভাগ নির্ণীত হইল। এইরূপ ইঁহাদের সবন, ঋতু, ছন্দ, স্তোম, সাম, কর্ম, স্ত্রী ও দেবগণের বিভাগ আছে। এই বিভাগের শাস্ত্রীয় নাম "ভক্তি"। ইঁহাদের প্রত্যেকের আবার 'সংস্তবিক দেব'ও আছেন। ত্রিদেবের বিভাগাদি কিরূপ, তাহা বলা যাইতেছে ঃ

অগ্নির লোক—পৃথিবী

"ত্রীণি জ্যোতিংষ্যজায়ন্তাগ্নিরেব পৃথিব্যাঃ"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৫।৫।৭)

সবন—প্রাতঃকাল

"অগ্নয়ে বসুভ্যঃ প্রাতঃ সবনে"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৩।২।২)

ঋতু—শরৎ ও বসন্ত

ছন্দ—গায়ত্রী, অনুষ্টুপ

স্তোম—ত্রিবৃৎ, একবিংশ

সাম—রথন্তর, বৈরাজ

কর্ম—হবির্বহন

দেবাবাহন

দার্ষ্টিবিষয়ক

সংস্তবিক দেব—রুদ্র, সোম, বরুণ, পর্জন্য, ঋতুগণ

ইন্দ্রের লোক—অন্তরিক্ষ

সবন—মধ্যান্দিন

ঋতু—গ্রীষ্ম, হেমন্ত

ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, পঙ্‌ক্তি

স্তোম—পঞ্চদশ, ত্রিণব

সাম—বৃহৎ, শাক্কর

কর্ম—রসানুপ্রদান

বৃত্রবধ

বলকৃতি

সংস্তবিক দেব—অগ্নি, সোম, বরুণ,

পূষা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, পর্বত,

কুৎস, বিষ্ণু, বায়ু, বরুণসহ মিত্র

পূষাসহ সোম, রুদ্রসহ সোম,

অগ্নিসহ পূষা, বাতযুক্ত পর্জন্য

সূর্যের লোক—দ্যো

সবন—তৃতীয় কাল

ঋতু—বর্ষা, শিশির

ছন্দঃ—জগতী, অতিছন্দাঃ

স্তোম—সপ্তদশ, ত্রয়স্ত্রিংশ

সাম—বৈরূপ, বৈরত

সূর্যের কর্ম—রসাদান

রসধারণ

প্রবহ্লিত

সংস্তবিক দেব—চন্দ্রমা, বায়ু, সংবৎসর

অগ্নির সহচর দেবগণ অথবা পৃথিবীস্থান-দেবতা বলিলে ৫২টি দেবতা বুঝাইত ঃ যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে ইঁহাদের নাম এইরূপ দিয়াছেন—

অগ্নিঃ, জাতবেদাঃ, বৈশ্বানরঃ

দ্রবিণোদাঃ, ইধ্মঃ, তনূনপাৎ, নরাশংসঃ, ইলঃ, বর্হিঃ, দ্বারঃ, উষাসনেক্তা, দেব্যাহোতারাঃ, ত্রিস্রদেবীঃ, ত্বষ্টা, বনস্পতিঃ, স্বাহাকৃতয়ঃ।

অশ্বঃ, শকুনিঃ, মন্ডূকাঃ, অক্ষাঃ, গ্রাবাণঃ, নারাশংসঃ, রথঃ, দুন্দুভিঃ, ইষুধিঃ, হস্তঘ্নঃ, আভীষবঃ, ধনুঃ, জ্যা, ইষু, অশ্বাজনী, উলূখলম্, বৃষভঃ, দ্রুঘণঃ, পিতুঃ, নদ্যঃ, আপঃ, ওষধয়ঃ, রাত্রিঃ, অরণ্যানী, শ্রদ্ধা, পৃথিবী, অপ্বা, অগ্নায়ী, উলূখলমুষলে, হবির্ধানে, দ্যাবাপৃথিবী, বিপাট্‌ছুতুদ্রী, আর্ত্নী, শুনাসীরৌ, দেবীজেষ্ট্রী, দেবীউর্জাহুতি।

অতঃপর অন্তরীক্ষস্থান-দেবতাগণের নাম নিরুক্তকার এইরূপ দিয়াছেন ঃ—

বায়ুঃ, বরুণঃ, রুদ্রঃ, ইন্দ্রঃ, পর্জন্যঃ, বৃহস্পতিঃ, ব্রহ্মণস্পতিঃ, ক্ষেত্রস্যপতিঃ, বাস্তোস্পতিঃ, অপান্নপাৎ, যমঃ, মিত্রঃ, কনু, সরস্বাক্ষ, বিশ্বকর্মা, তার্ষ্য, মন্যুঃ দধিক্রা, সবিতা, ত্বষ্টা, বাতঃ, অগ্নিঃ, বেনঃ, অসুনীতিঃ, ঋতঃ, ইন্দুঃ, প্রজাপতিঃ, অহিঃ, অহির্বুধ্যঃ, সুপর্ণঃ, পুরুরবা ॥ ৩২ ॥

অশ্বিনৌ, উষাঃ, সূর্যা, বৃষাকপায়ী, সরণ্যুঃ, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগঃ। দ্যুস্থান-দেবতাগণ বলিলে নিম্নলিখিত দেবতাকে বুঝায়—সূর্যঃ, পূষা, বিষ্ণুঃ, বিশ্বানরঃ, বরুণঃ, কেশী, কেশিনঃ, বৃষাকপিঃ, যমঃ, অজএকপাৎ, পৃথিবী, সমুদ্রঃ, দধ্যঙ্, অথর্বা, মনুঃ, আদিত্যাঃ, সপ্তঋষয়ঃ, দেবাঃ, বিশ্বদেবাঃ, সাধ্যাঃ, বসবঃ, বাজিনঃ, দেবপত্ন্যো, দেবপত্ন্য।

নিঘণ্টুতে প্রথমতঃ অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবপত্ন্য পর্যন্ত দেবলোকের একটি ক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তারপর নিঘণ্টুর শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা দেবতাদিগের গণ নিরূপিত হইয়াছে। তদনুসারে আমরা উপরে গণ-বিভাগ করিয়া দিয়াছি। নিঘণ্টুর শ্লোক এই—

"আগ্ন্যাদির্দেবী উর্জাহুত্যন্তঃ ক্ষিতিগতো গণঃ।
বায়্যাদয়ো ভর্গান্তাঃ স্যুরন্তরিক্ষস্থদেবতাঃ ॥
সূর্যাদিদেবপত্ন্যন্তা দ্যুস্থান-দেবতা ইতি ॥"

সূচনায় দিগ্দর্শন হিসাবে দেবতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম মাত্র। দেবতত্ত্বের আনুপূর্বিক আলোচনা বিরাট্ ব্যাপার। পৃথক্ গ্রন্থে তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে পৃথিবী-স্থান দেব অগ্নি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিব। বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অগ্নিদেব যজ্ঞাগ্নির অধিষ্ঠাতৃদেব। যজ্ঞক্রিয়া ব্রাহ্মণযুগে খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ইহার সার্থকতাও সে সময়ে বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। সেই সময়ে সকল কাজেই যজ্ঞের ধূম দেখা যাইত। এই যজ্ঞ সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানা কথা আছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছিলেন, —প্রজাপতি কামনা করিলেন, তিনি বহু হইবেন। তিনি তাই তপশ্চরণ করিলেন। তপ করিয়া তিনি আপনার অঙ্গের যজ্ঞসূত্ররূপ এই দ্বাদশাহ দেখিতে পাইলেন এবং নিজ অঙ্গ হইতেই তিনি তাহা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। তিনি তাহা আহরণ করিয়া তাহাতেই যজন করিলেন।

প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয় ভুয়াংস্যামিতি স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্‌ত্বা দ্বাদশাহমপস্যদাত্মন এবাঙ্গেষু চ প্রাণেষু চ তমাত্মন এবাঙ্গেভ্যশ্চ দ্বাদশধা নিরমিমীত তমাহরত্তেনযজত ।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে আছে,—প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন—তিনি বহু হইবেন। তিনি অমনই এই অগ্নিষ্টোম দর্শন করিলেন। তাহা আহরণ করিয়া, তৎসাহায্যে এই সমগ্র প্রজা সৃষ্টি করিলেন।

প্রজাপতিরকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি সত্ত এতমগ্নিষ্টোমমপশ্যও মাহরত্তেনেমাঃ প্রজা অসৃজত।

প্রজাপতির যজ্ঞ সৃষ্টি করার কথা বহুস্থানেই আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতার 'প্রজাপতিঃ যজ্ঞং অসৃজত' প্রভৃতি বচন দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

হিন্দুদিগের অনুষ্ঠান নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত। নিত্যক্রিয়া মানুষের অবশ্য করণীয়, নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় অনুষ্ঠাতার প্রয়োজন ও ইহা ইচ্ছাসাপেক্ষ। এই অনুষ্ঠান নানা ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

যজ্ঞ সকল আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর যজ্ঞকে নিত্যকর্ম, আর এক শ্রেণীর যজ্ঞকে নৈমিত্তিক কর্ম বলা হয়। এতদ্ব্যতীত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানও আছে। এই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান প্রায়ই যজ্ঞকার্যে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায়শ্চিত্তকে যজ্ঞের অঙ্গ বলা যাইতে পারে না। ইহা একটি অতিরিক্ত অনুষ্ঠান। শাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। দেবতাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের কথা শুনা যায় না, এবং যাচ্ঞাসূচক বা প্রার্থনাসূচক অনুষ্ঠান খুব কমই অনুষ্ঠিত হয়। দেবগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ লইবার জন্য আহূত হন। তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা বা তাঁহাদিগের নিকট কোনরূপ প্রার্থনা জানান হয় না। যজ্ঞে দেবতাদিগকে মন্ত্রবলে সাহায্য করিতে বাধ্য করা হয়। জাতিতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে, মানব-জাতির আদিম উপাসনা নৈতিক ভাববর্জিত; কারণ, আদিম মানবেরা আত্মরক্ষা ও স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া উপাসনা করিত। হিন্দুর যাগযজ্ঞাদির মূলেও অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত নৈতিক ভাবের অভাব দেখিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুর পুরুষমেধ ও সর্বমেধ সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগসূচক যজ্ঞ। এই দুই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ সর্বস্ব -ও সংসার-ত্যাগী হন।

এই সমস্ত যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপের উদ্দেশ্য দেবগণ ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করা। ঋষিদিগের বিশ্বাস যে তাঁহাদের নিজেদের যেমন দেব ও পিতৃগণের সাহায্যের প্রয়োজন, দেবগণ ও পিতৃগণেরও সেইরূপ তাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন। দেবগণ স্বর্গে ও পিতৃগণ অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর মানবের শুভ সম্পাদন করেন, সেই জন্য মানবগণ তাঁহাদের নিকট ঋণী। মানবগণের দেবঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। শুনা যায়, প্রাচীনকালে মানবগণ পূর্বপুরুষদের পূজা করিত। তাহাদের

বিশ্বাস ছিল, পূর্বপুরুষগণ পরলোকে থাকিয়া অসন্তুষ্ট হইলে ইহলোকবাসী মানবগণের অমঙ্গল, ও সন্তুষ্ট হইলে মঙ্গল বিধান করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, হিন্দুদিগের পিতৃকার্যের প্রবৃত্তির ইহাই কারণ। কিন্তু পিতৃপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাই যে পৈত্র্যকার্যে প্রবৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

আমরা হিন্দু। আমরা পিতৃঋণ পরিশোধার্থ পিতৃকার্য করিয়া থাকি। আমাদিগের পিতৃকার্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত। আমাদের ধর্মভাবের সহিত অন্যজাতির ধর্মভাব মিশ্রিত আছে, একটু অনুসন্ধান করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তবে খাঁটি হিন্দু-ভাবকে বাছিয়া বাহির করাও যায়। খাঁটি হিন্দু-ভাব বলিলে কি বুঝায়? ঋষিদিগের বিশ্বাস, দেহ বিনষ্ট হইলে, মানুষ মরে না, মানুষ দেহ নহে, মানুষ আত্মা। মানুষ ভৌতিক দেহ অবলম্বন করিয়া ভৌতিক জগতে শক্তি সঞ্চয় করে, এবং সেই শক্তিবলে তাহার স্বর্গভোগ হয়। যে শক্তিতে মানব স্বর্গভোগ করে, তাহাকে পুণ্য বলে। পুণ্যক্ষীণ হইলে পুনরায় তাহাকে মর্ত্যলোকে আসিতে হয়। পিতার উদ্দেশ্যে পুত্র এমন কতকগুলি পুণ্যকার্য করিতে পারে যাহাতে পিতার ঊর্ধ্বগতি হয়। হিন্দু সেই জন্য সৎপুত্র কামনা করে। ইহলোকে যেমন শরীর পোষণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন, পরলোকেও পিতৃগণের, তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীর পোষণের নিমিত্ত খাদ্যের প্রয়োজন। হিন্দুর সকল শাস্ত্র বেদমূলক। বেদ আর্যদিগের শাস্ত্র। আর্যগণ অনার্যদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন জিনিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের ধর্ম অনার্য-ভাবাপন্ন হয় নাই। অনার্যদিগের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার তাঁহাদের ধর্মকে সম্প্রসারিত করিয়াছে। সকল মানবজাতির মধ্যে সাধারণ কিছু আছে। দেশ, কাল, পাত্রভেদে সেই সাধারণ কিছু মানবজাতিতে বিভক্ত হইয়া আছে। জাতিসকলের মধ্যে যেমন সাধারণ কিছু আছে, তেমনি অসাধারণ কিছুও বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিশেষ বিশেষ আছে। সেই অসাধারণ কিছু জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। আর্যধর্ম যদি অনার্যধর্ম হইতে সাধারণ সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আর্যজাতি অনার্যজাতির ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। হিন্দুধর্ম সম্প্রসারিত আর্যধর্ম। ইহা অনার্য-মিশ্রিত আর্যধর্ম নহে।

এই সুখ-দুঃখময় জীবনের সঙ্গে যদি আমার পারমার্থিক ভাবে সম্বন্ধ থাকে, এবং আমার সুখ-দুঃখের কারণ আমার অতিরিক্ত অপর কিছুতে যদি নিহিত থাকে, তাহা হইলে আমাকে নির্ভরশীল হইতে হয়। কিন্তু আমার সুখ-দুঃখময় জীবনের কারণ-রূপে জ্ঞানময়, চৈতন্যময় যদি কেহ না থাকে, যদি অন্ধ জড়শক্তির প্রভাবেই আমার সুখ-দুঃখময় জীবন সম্ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল হওয়া বৃথা প্রয়াস। ঘটনাচক্রে যাহা হইবার তাহাই হইবে। সে অবস্থায় বুদ্ধিপূর্বক ঘটনাস্রোতকে আমার অনুকূলে ফিরাইতে হয়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া

দেখিলে আমার বুদ্ধি আমার আয়ত্তের মধ্যে নাই ; এই বুদ্ধি ঘটনাচক্রে আমার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ঘটনাচক্রে যে বুদ্ধি আমার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, ঘটনাচক্রে তাহা আবার আমা হইতে বিযুক্ত হইতে পারে। ঘটনাচক্রে আমি উপস্থিত যে বুদ্ধি পাইয়াছি, তাহার স্থিতিকাল পর্যন্ত সেই বুদ্ধির যতটুকু আমার অনুকূলে ফিরাইতে পারা যায়, আমি কেবল ততটুকুই ফিরাইতে পারি। যদি বুঝা যায় যে, আমার জন্মের পূর্ব হইতে এই বুদ্ধির সূত্রপাত হইয়াছে, এবং আমার মৃত্যুর পরেও এই বুদ্ধি অতি সূক্ষ্মাকারে আমার সহিত সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলেও এই বুদ্ধি আমার আয়ত্তে নাই, ইহা ঘটনা-স্রোতেরই আয়ত্ত। আমাকে সে অবস্থায় ঘটনাস্রোতের উপর নির্ভর করিতে হয়। সে অবস্থায় আমার উপাসনা- বা আরাধনা-প্রবৃত্তি নিরর্থক। অন্ধ প্রকৃতির ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া আমার গতি যাহা হইবার তাহাই হইবে। হিন্দু এ অবস্থায়ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় না। হিন্দু-দর্শনের মূলমন্ত্র এই যে, প্রকৃতি প্রকৃতির কার্য করুক তাহাতে বিমূঢ় বা অবশ হইবার প্রয়োজন নাই। আত্মার প্রকৃতিজ সুখ-দুঃখের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মার বিমুক্তি সাধন করাই কর্তব্য। অথবা প্রকৃতিকে আত্মারই শক্তিরূপে দর্শন করিয়া সেই প্রকৃতির উপর আত্মার আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রকৃতির বশীকরণ কর্তব্য। কিন্তু ইহা হৃদয়ংগম করাও বুদ্ধি বা জ্ঞানের কার্য। এই বুদ্ধি বা জ্ঞান যদি আমার আয়ত্তে না থাকে, তাহা হইলে এই বুদ্ধি বিলুপ্ত হইলে, আমি আবার প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইব। কিন্তু হিন্দু দার্শনিক প্রকৃতির সহিত নির্লিপ্ত ভাবকেই মুক্তির সাধক বলিয়া মনে করেন। এইরূপ মনে করিবার মূলে একটা কিছু আছে। তাহা এই যে, হিন্দুর বিশ্বাস, প্রকৃতি একদিকে যেমন আত্মার বন্ধনের কারণ, তেমনই আবার অপরদিকে মুক্তির সহায়তা করিয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ নিত্য ও চিরস্থায়ী। প্রকৃতি আত্মার বন্ধন ও মুক্তির কারণ একথা বলিলে বুঝিতে হয় যে, প্রকৃতি প্রথমে আত্মাকে বন্ধন করে, এবং তাহার পর আত্মার মুক্তির পথ হয়। বন্ধনের পূর্বে আত্মার সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে, প্রকৃতি আত্মাকে বন্ধন করিতে পারে না, প্রকৃতিজ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হইলেও আত্মার মুক্তির সার্থকতা থাকে না ; সুতরাং বুঝিতে হইবে প্রকৃতির সহিত আত্মার নিত্য সম্বন্ধ। কিন্তু আত্মা চেতন, প্রকৃতি জড়। চেতন জড়ের আয়ত্তে আছে এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, প্রকৃতি আত্মার কার্যের সুবিধার জন্য যন্ত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রকৃতি আত্মার মায়াশক্তি। কিন্তু দেখা যায় যে, জীব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে অক্ষম। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, জীব আত্মার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে। আত্মার আর একটা দিক্ আছে, যাহা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখিয়াছে। হিন্দু দার্শনিকের মতে তাহাই ঈশ্বর। জীবভূত আত্মা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল হইতে পারে।

উপাসনা হিন্দুধর্মের অন্তরনুষ্ঠানের দিক্। ইহাতে আচার ও বাহ্য অনুষ্ঠানও অবলম্বিত হয়।

ধর্ম মানব-জীবনে অবশ্য-পালনীয় এবং ধর্মভাব মানবের স্বভাবিক ভাব। কিন্তু ধর্মেরও দুইটি দিক্ আছে। একটি ভাবের দিক্, আর একটি ক্রিয়ার দিক্। ধর্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়া-পালনের উদ্দেশ্য মানবের পারমার্থিক উন্নতি। জড়জগতের উন্নতি বা বৈষয়িক উন্নতিতে মানবের সম্পূর্ণ চরিতার্থতা হয় না; সুতরাং তাহার পারমার্থিক উন্নতিরও প্রয়োজন আছে। মানবের ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ধর্মের বৈশিষ্ট্য মানবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। মানবের ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ আছে, সুতরাং মানব-মন চিরকালই ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট। ঈশ্বর আছেন জানিয়াই মানব চরিতার্থ হয় না; ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সংযোগ-সাধনে মানবের চেষ্টা আছে। সেই চেষ্টাই সকল ধর্মানুষ্ঠানের মূলীভূত কারণ। মানবের স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার নিরর্থক নহে। তাহার স্বাভাবিক ধর্মবিশ্বাস জ্ঞানমূলক ও বুদ্ধিগম্য। আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, কুসংস্কারাপন্ন হইয়া মানবের সেই স্বাভাবিক ধর্মাচার ও বিশ্বাস বিকৃতি-প্রাপ্ত হয়।

উপাসনার উদ্ভব কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল? মানব-মনে একটা নির্ভরের ভাব চিরকালই আছে। মানব জানে, সকল কার্য তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। আর একটা শক্তির উপর তাহার শুভাশুভ নির্ভর করে। অনেক বিষয়ে মানুষ মানুষের মুখাপেক্ষী হইতে পারে, কিন্তু সকল বিষয়ে সে তাহা পারে না। একটা শক্তি আছে যাহা দ্বারা জগৎ চলিতেছে, যাহা সকল করিতে সমর্থ। মানুষ স্বভাবতঃ সম্ভ্রম ও ভক্তিমিশ্রিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। মানব সেই শক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়া যে ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হয়, তাহাই উপাসনা-প্রবৃত্তির উত্তেজক। সকল জাতির প্রাথমিক চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে, এই সাধারণ প্রবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সর্বপ্রথমে মানব সেই শক্তিকে নানা আকারে নানা ভাগে বিভক্ত অবস্থায় দেখে, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা যে একই শক্তি নানা আকারে প্রতীয়মান ও ক্রিয়াশীল, তাহা সে বুঝিতে পারে। মানবের প্রাথমিক অবস্থার এই স্বাভাবিক ভাব অতি পবিত্র। কিন্তু যখন মানব সেই শক্তিকে তুষ্ট বা বাধ্য করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিবার প্রয়াস পায়, তখনই মানবের এই পবিত্র ভাব কলুষিত হইয়া তাহার স্বাভাবিক উপাসনা-পদ্ধতি বিকৃত ও অবনত হয়। মানুষ বহুকাল ধরিয়া আপনার অনুকূলে ও শত্রুর প্রতিকূলে দেবতাকে বাধ্য করিবার চেষ্টা পাইয়া আসিয়াছে। প্রয়োজনবিশেষে দেবতার ক্রোধশান্তি ও প্রয়োজনবিশেষে তাঁহার ক্রোধোদ্রেক করিবার জন্য মানব নানা উপায় অবলম্বনও করিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশের নানা প্রকার ধর্মানুষ্ঠান এই সকল চেষ্টার ফল। যদি মানব-জাতির প্রকৃতির মূলে অলৌকিক ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন দেবের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস না থাকিত তাহা হইলে কোন প্রকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর কোন অংশে বহুকাল

ধরিয়া প্রশ্রয় পাইতে পারিত না। পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন—সকল মানব এক গঢ়ে সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ ও সচরাচর বহু মানব একটি মানবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। কোন জাতির মানবের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁহার মনের ভাব, সেই সমগ্র জাতির মনের ভাব। একজন প্রতীচ্য মনীষী বলিয়া গিয়াছেন যে, কোন জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে সমগ্র জাতিটির মনের ভাব জানিতে ও সেই জাতিটিকে চিনিতে পারা যায়। শ্রেষ্ঠ মানবের ভাব ও জ্ঞান সমগ্র জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শ্রেষ্ঠমানবসকল ঈশ্বরের ভাব ও জ্ঞান-সঞ্চালনের প্রণালী। প্রথমে একটি মানুষ জ্ঞানী হয়, তার পর সকল মানুষ সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। শ্রুতি শ্রেষ্ঠ মানব-সকলের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি। প্রাচীন আর্য হিন্দুরা শ্রুতি বিস্মৃত হইতে সাহস করিতেন না। শ্রুতি-লোপ বিশেষ দুর্দৈব বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। সকল জাতিরই tradition আছে। সকল জাতিরই বিশ্বাস, তাহা ঈশ্বরের বাণী।

সরস্বতী

"যা কুন্দেন্দু-তুষারহারধবলা যা শ্বেত-পদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥"

সর্বাগ্রে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে শরণ লইয়া কার্যারম্ভ করি।

সরস্বতী-বন্দনা

পুরাকাল হইতে একটা নিয়ম চলিয়া আসিতেছে,—মহাভারত আরম্ভ করিবার পূর্বে বলাই চাইঃ

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

নারায়ণকে, নরের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ সেই নর ঋষিকে, দেবী সরস্বতীকে এবং ব্যাসকে নমস্কার করিয়া, তার পর 'জয়'* অর্থাৎ মহাভারত বলিতে আরম্ভ করিবে।

এই প্রথা অনেক দিন চলিয়া আসিয়াছে। এই প্রথার পূর্বে সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া কোন কার্যারম্ভ কোথাও দেখা যায় না। ইহার পরে কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যে অনেক কবিই গ্রন্থারম্ভে বা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের পূর্বে সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন। প্রকাণ্ড ফিরিস্তি-বিভীষিকা আছে বলিয়া তালিকা-প্রদানের চেষ্টা করিলাম না। আমাদের প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে অধিকাংশ স্থলে কবিগণও এই রীতি অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। কৃত্তিবাস বলেন,—

'সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।'
তাই 'কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী-বরে।'

শ্রীকৃষ্ণবিজয়কার বলিয়াছেন—

'লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দ তাঁহার দুই নারী।'

বিজয় গুপ্তও (পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২) এই দুই দেবীর উদ্দেশে বলিলেন—

'লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দম দেবী দুইজন।'

---

* মহাভারতের প্রাচীন নাম "জয়"। 'জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা।' —মহাভারত, আদি ৬২ অঃ, ২২ শ্লোক।

চিত্র—১

আসীনা সরস্বতী
(মহাকালী পাঠশালায় রক্ষিত)

ই'হার গ্রন্থে শুধু সরস্বতীর বন্দনাও আছে, যথা—

'সরস্বতী দেবী বন্দম বচনদেবতা।'

দ্বিজ রঘুনাথ (মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, পৃ. ২) ই'হাদের পদ্মাসনে বসাইয়াছেন—

'পদ্মাসনে বন্দি সেই লক্ষ্মী সরস্বতী।'

রতিদেবের (মৃগলুব্ধ, পৃ. ১) বন্দনা—

'প্রণমোহ সরস্বতী শঙ্কর চরণ।'

ভবানীপ্রসাদ (দুর্গামঙ্গল, পৃ. ২) গায়িলেন—

'প্রণাম করিয়ে মা কল্যাণী সরস্বতী।'

ক্ষেমানন্দ (মনসামঙ্গল, পৃ. ৪) প্রার্থনা করিলেন—

'সাবধান হঞা বন্দো দেবী সরস্বতী।'

রামেশ্বর চক্রবর্তীও (শিবায়ন, পৃ. ৪) দেবীর প্রতি.ভক্তি দেখাইয়াছেন—

'দেবী সরস্বতী প্রতি নতি অতিশয়।'

অদ্ভুতাচার্য (রামায়ণ, পৃ. ২) বলিয়াছেন—

'সরস্বতী মাএ বন্দো জগতগোসানী।'

জগৎরাম (দুর্গাপঞ্চরাত্রি, পৃ. ৩) দেবীকে বিষ্ণুশক্তিরূপিণী ভাবিয়া বলেন—

'বিষ্ণুর বনিতা বাণী বন্দিয়া চরণে।'

ভবানীশঙ্কর 'মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা' (পৃ. ১০) রচনা করিতে করিতে লিখিলেন—

'প্রণতি করিয়া বন্দম ভারতী-চরণে।'

বিজয়রাম সেন 'তীর্থমঙ্গল'-রচয়িতা। তিনি গ্রন্থ লিখিবার পূর্বেই বলিলেন—

'লক্ষ্মী সরস্বতী গৌরী তাঁহার চরণ ধরি
বন্দিলাম দেব ত্রিলোচন।'

ভবানীনাথ (লক্ষ্মণদিগ্বিজয়, পৃ. ১) সরস্বতীর সঙ্গে গণেশকে প্রণাম করিয়াছেন—

'গণেশ দেবতা বন্দ আর সরস্বতী।'

চৈতন্যভাগবতকারের 'জিহ্বায় স্ফুরায় তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী।' পৃ. ৩

লোচনদাসের (চৈতন্যমঙ্গল, পৃ. ১) প্রার্থনা এইরূপ—

'সরস্বতী বন্দো মুণ্ডে কেলি কর মোর তুণ্ডে
কহ গৌরহরিগুণকথা।'

দুঃখী শ্যামদাস (গোবিন্দমঙ্গল, পৃ. ২) গাহিলেন—

'সরস্বতী বন্দো মাগো মধুর পঞ্চম রাগে
বিষ্ণুর বল্লভা বীণাপাণি।'

দুর্লভ মল্লিক (পৃ. ২২) 'সরস্বতী দেবী বন্দো জাহা হইতে তরি'—পদে গোবিন্দচন্দ্রের গীতের সুর ধরেন।

সুকুর মহম্মদ 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে'র কথায়

'নম মাতা সরস্বতী বিখ্যাত সংসারে'

বলিতে ছাড়েন নাই।

মধুসূদন নাপিতও 'ভারতীপদারবিন্দে করিয়া ভকতি' নৈষধচরিত রচনা করেন।

এ ছাড়া রমাই পণ্ডিত (ধর্মপূজা-বিধান,), মাণিক গাঙ্গুলী (ধর্মমঙ্গল), বংশীদাস (পদ্মাপুরাণ), মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী), ঘনরাম (ধর্মমঙ্গল), ভারতচন্দ্র (অন্নদামঙ্গল), রামপ্রসাদ (বিদ্যাসুন্দর), প্রেমানন্দ দাস (মনসার ভাসান) প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে একটি করিয়া স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ 'সরস্বতী-স্তব' প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীপঞ্চমী

মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজা। এই দিন সারস্বত উৎসব। এই তিথির একটি বিশেষ নাম—শ্রীপঞ্চমী। শ্রী মানে কিন্তু লক্ষ্মী।* পৌরাণিক যুগের পূর্বে শ্রী পৃথক্ দেবতা ছিলেন। লক্ষ্মীরও প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। শ্রী ও লক্ষ্মী সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন। ক্রমশঃ শ্রী ও লক্ষ্মীর মধ্যে পার্থক্য ঘুচিয়া

* ঋগ্বেদে 'লক্ষ্মী' শব্দের প্রয়োগ একবার মাত্র আছে। আর সেখানে তিনি সৌভাগ্য-দেবীও নন। ঋগ্বেদ বলেন—

"ভদ্রা এষাং লক্ষ্মী নিহিতা অধিবাচি"—১০.৭১.২। এ লক্ষ্মীর অর্থ অন্যরূপ। অথর্ববেদে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবতী রমণীকে লক্ষ্মী বলা হইয়াছে। লক্ষ্মী কখন ভাল, কখন মন্দ। অথর্ববেদে (৭.১১৫.১) লক্ষ্মীকে 'পাপি লক্ষ্ম' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। 'পুণ্যা লক্ষ্মীঃ'ও (৭.১১৫.৪; ১২.৫.৬) আছেন।

বাজসনেয়ী সংহিতাতে (৩১-২২) লক্ষ্মী ও শ্রীকে আদিত্যের পত্নীদ্বয় করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায়ও লক্ষ্মী ও শ্রী আদিত্যের দুই স্ত্রী। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১১.৪.৩.১) শ্রী প্রজাপতি হইতে সঞ্জাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কম্পমানা শ্রীর জ্যোতিষ্মতী মূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য দেবতাদের লোভ হয়। তাঁহারা প্রজাপতির নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা শ্রীকে মারিয়া তাঁহার দানগুলি আত্মসাৎ করিতে চান। প্রজাপতি বলিলেন,—পুরুষ সাধারণতঃ স্ত্রীলোককে মারে না। শ্রীকে প্রাণে না মারিয়া তাহার দানগুলি লইতে বলেন। ফলে অগ্নি তাঁহার অন্ন, সোম—রাজ্য, বরুণ—সাম্রাজ্য, মিত্র—ক্ষত্র, ইন্দ্র—বল, বৃহস্পতি—ব্রহ্মচর্য, সবিতা—রাষ্ট্র, পূষা—ভগ, সরস্বতী—পুষ্টি, ত্বষ্টা—রূপ (শতপথব্রাহ্মণ, ১১.৪.৩.৪)। শ্রী বলিলেন, প্রজাপতি, আমার সকলই ইহারা লইল। প্রজাপতি বলিলেন, যজ্ঞে তুমি এগুলি ফিরিয়া পাইবে। শ্রী সফলকামা হইলেন।

চিত্র—২

ক

হৈসল-স্থাপত্যে আসীনা সরস্বতী

খ

দণ্ডায়মানা সরস্বতী

গেল। উভয়ে অভিন্ন দেবতায় পরিণত হইলেন। শ্রীপঞ্চমীও লক্ষ্মীপঞ্চমীর দ্যোতক হইল। পরে কিন্তু এই তিথির অধিকারিণী লক্ষ্মী না হইয়া সরস্বতী হইলেন। এরূপ হইল কেমন করিয়া? মহাভারতে (বনপর্ব, ২২৯ অধ্যায়) শ্রীপঞ্চমী নামের একটি, কারণ দেখান হইয়াছে। এই তিথিতে একটি মস্ত উৎসব হইয়াছিল, আর সেটি বিবাহোৎসব। স্কন্দের সঙ্গে সেই দিন লক্ষ্মীর শুভ পরিণয় হইয়াছিল। ইন্দ্রের মাতৃস্বসার একটি কন্যা ছিলেন। তাঁহার নাম দেবসেনা। দেবসেনার অপর নাম লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, আশা, সুখপ্রদা, সিনিবালী, কুহু, সদ্বৃত্তি ও অপরাজিতা। ইঁহার উপর কেশী অত্যাচার করায়, ইন্দ্র দেবসেনার (লক্ষ্মীর) রক্ষার জন্য কেশীকে হত্যা করেন। লক্ষ্মীর বিবাহের জন্য ইন্দ্র ভাল পাত্র খুঁজিতে থাকেন। যখন তিনি দেখিলেন, স্কন্দ ছয় দিনে সকল স্থান জয় করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ দিলেন। বিবাহে পৌরোহিত্য করেন বৃহস্পতি। আর দেবী লক্ষ্মী শরীরিণী হইয়া স্কন্দকে আশ্রয় করেন। পঞ্চমী তিথিতে শ্রী স্কন্দকে আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া এই উৎসবের স্মারক হইয়া দাঁড়াইল—'শ্রীপঞ্চমী'। কাজেই শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীরই পূজার বিধি হওয়া উচিত। যাহা হউক, বাঙলার নিবন্ধকার রঘুনন্দন 'সংবৎসর-প্রদীপ' উদ্ধার করিয়া ব্যবস্থা দিলেন—

"পঞ্চম্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীং পুষ্পধূপান্নবারিভিঃ।
মস্যাধারং লেখনীঞ্চ পূজয়েন্ন লিখেত্ততঃ॥
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া।
তস্যাং পূর্বাহ্ণ এবেহ কার্যঃ সারস্বতোৎসবঃ॥"

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী লক্ষ্মীর বড় প্রিয়।* সুতরাং পুষ্প, ধূপ, অন্ন, বারি দিয়া লক্ষ্মীপূজা করিতে হইবে। বেশ কথা। কিন্তু 'মস্যাধারং লেখনীঞ্চ পূজয়েৎ' কেন? তিনি তো কালি কলমের ধার ধারেন না! ইহার একটু রহস্য আছে। দেশের লোকেরা যখন স্মৃতি ও অন্য শাস্ত্র ভুলিয়া যায়, অথচ যে কোন কারণেই হউক, কতকগুলো সংস্কার যখন দেশাচার হইয়া দাঁড়ায়, তখন সেই অনুষ্ঠানগুলিকে

---

* রঘুনন্দন কিন্তু 'শ্রিয়ঃ প্রিয়া' এই বচনের 'শ্রিয়ঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন "সারস্বত ইত্যুপাদানাৎ শ্রিয়ঃ সরস্বত্যাঃ।" তিনি নিজমতের সমর্থনের জন্য ব্যাড়ির অভিধানও তুলিয়া বলিয়াছেন—

"লক্ষ্মীসরস্বতীধীত্রিবর্গসম্পদ্বিভূতিশোভাসু।
উপকরণবেশরচনাবিধাসু চ শ্রীরিতি প্রথিতা॥"

এই শ্লোকটি ব্যাড়ি হইতে উদ্ধৃত কোন প্রাচীন বচনে পাওয়া যায় না। ভানুজী দীক্ষিত-কৃত অমরকোষের টীকায় এ শ্লোকটি আছে। ইহা আধুনিক গ্রন্থ। খুব সম্ভব পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়া থাকিবে।

সংশোধন বা সমর্থন করিবার জন্য নূতন করিয়া শাস্ত্র তৈরি করিতে হয়। এই শাস্ত্রই হইল নিবন্ধ। রঘুনন্দনের 'তিথিতত্ত্ব' প্রভৃতি এইরূপ নিবন্ধগ্রন্থ।

লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর বনে না—আজকাল একথা বলিতে যাওয়া নিরাপদ্ নয়। কিন্তু যে কোনও কারণেই হউক, সরস্বতী লক্ষ্মীদেবীকে এই তিথিতে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য দাবী হইতে বঞ্চিত করিয়া পূজার ভাগটা নিজেই আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সরস্বতী-পূজা পঞ্চমী তিথিতে হইয়া থাকে। কত দিন হইতে এই তিথিতে বাগ্‌দেবীর পূজা চলিয়া আসিতেছে, তাহা জানা যায় না। তবে এ সম্বন্ধে পুরাণের একটা দোহাই আছে। কৃষ্ণযোষিতের মুখ হইতে বাগ্‌দেবী আবির্ভূতা হইলেন। অমনি বাগ্‌দেবীর প্রবল ইচ্ছা হইল, যেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পান; 'ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী।'† কৃষ্ণ তখন রাধাগত প্রাণ; তিনি অন্যদার হন কেমন করিয়া? কাজেই বাগ্‌দেবীকে বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে পাওয়াও যা, বিষ্ণুকে পাওয়াও তাই—বিষ্ণু কৃষ্ণেরই স্বরূপ; তিনি বিষ্ণুকেই পতিত্বে বরণ করুন। সরস্বতীর হাত হইতে নিজে রক্ষা পাইয়া, তাঁর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিবার জন্যই বোধ হয় বলিলেন—

"পতিং তমীশ্বরং কৃত্বা মোদস্ব সুচিরং সুখম্।"

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৪ অঃ, ১৯ শ্লোক

আরও বলিলেন, লোকে সরস্বতীর পূজা করিবে—

"মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং
বিদ্যারম্ভেষু সুন্দরি"—ঐ, ২২ শ্লোক

পুরাণ বলিয়াছেন—

"আদৌ সরস্বতী পূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্মিতা।
যৎপ্রসাদাদ্ মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥"—ঐ, ২০ শ্লোক

শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকে হউক, অথবা পরে যে কোন সময় থেকে হউক, মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতীদেবী নৈবেদ্য লাভ করিতে লাগিলেন। পূজার দিনের নামটা কিন্তু শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীপঞ্চমীই রহিয়া গেল। একটা সামঞ্জস্য হওয়া দরকার। স্মৃতিকার রফার ব্যবস্থা করিলেন;—শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মীর তিথি, লক্ষ্মীই পূজা পাবেন; তবে সরস্বতীর সম্মানের জন্য দোয়াত কলমের পূজা হইবে, আর কেহ সে দিন লিখিতে পারিবে না। এটুকুও সাব্যস্ত হইল যে, পঞ্চমীর গোড়ার দিকে সারস্বত উৎসব হইবে। যাঁর উৎসব, তাঁর সঙ্গেই লোকের সম্বন্ধ। পূজায় লক্ষ্মীকে বড়

---

† "আবির্ভূতা যদা দেবী বক্ত্রতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ।
ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী॥"
—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৪ অঃ, ১১ শ্লোক

চিত্র—৩
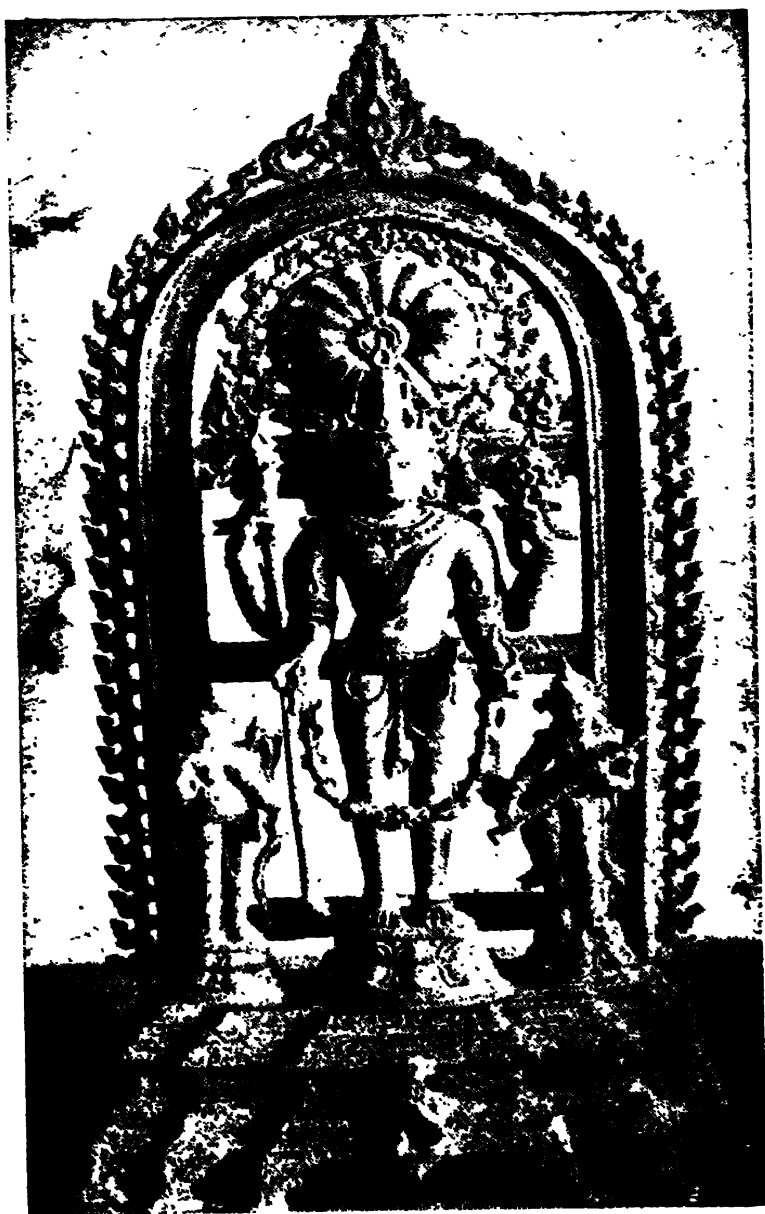
বিষ্ণুর পরিবার-দেবতারূপে দণ্ডায়মানা সরস্বতী
(রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত মূর্তি)

একটা কেউ আমলেই আনিল না। লক্ষ্মী সরস্বতীর ভাগ হইতে এক রকম বঞ্চিত হইয়াই পড়িলেন। তিনি কেবল দুটো মন্ত্রের সঙ্গে একটুকুরা ফুল পাইতে লাগিলেন মাত্র। ভবিষ্যপুরাণ লক্ষ্মীদেবীর দিকে একটু ওকালতি করিয়া, শ্রীপঞ্চমীর দিন লক্ষ্মীর ছয় বৎসরব্যাপী এক ব্রতের আইন জাহির করিয়া লইলেন—

"মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া।
তস্যামারভ্য কর্তব্যং বৎসরান্ ষট্ ব্রতোত্তমম্॥"

শ্রীপঞ্চমীর দিন সরস্বতী পূজা হয়। অমরসিংহের সময় পর্যন্ত প্রাচীন কোন কোষগ্রন্থে 'শ্রী' শব্দের অর্থ সরস্বতী না থাকিলেও, মধ্যযুগের আচার্য মেদিনীকর হেমচন্দ্র, জটাধর প্রভৃতির অভিধানে সরস্বতীর একটি নাম হইল 'শ্রী'; এদিকে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজা; কাজেই ক্রমশঃ শ্রীপঞ্চমী নামও বেশ খাপ খাইয়া গেল।

সরস্বতী-পূজার তিথি

আজকাল সরস্বতীপূজা মাঘী পঞ্চমী তিথিতে হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন যুগে কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। কৃষ্ণযজুর্বেদ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, নবমীতে সরস্বতীকে উৎসর্গ করিবার বিধি। শতপথব্রাহ্মণ বলিয়াছেন যে, পূর্বকালে পূর্ণিমা তিথিতে সরস্বতীর নিকট অঞ্জলি দেওয়া হইত। এখন শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে। মাঘকৃত্যসম্পর্কে স্মৃতিকার ও নিবন্ধকারগণ কয়েকটি মত প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ষক্রিয়াকৌমুদী ব্রহ্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ করিয়াছেন—

"চতুর্থী বরদা শুক্লা তস্যাং গৌরী সুপূজিতা।
সৌভাগ্যমতুলং কুর্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি শ্রিয়ম্॥"*

মাঘী শুক্লা চতুর্থীতে গৌরী পূজার বিধি। ঐ তিথিতে গৌরী পূজা করিলে অতুল সৌভাগ্য হইয়া থাকে। আর পঞ্চমী তিথিতে শ্রীর পূজা করিতে হয়।

বর্ষক্রিয়াকৌমুদী (পৃ. ৪৯৮) এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"সরস্বতীপূজা অনধ্যায়শ্চ গৌড়াচারঃ।" গৌড়দেশে এই পঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজা হয়। ঐ দিন পড়িতে নাই।

বিধানপারিজাত (৩য় স্তবক, পৃ. ৭০৬) বরাহপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া

---

* নির্ণয়সিন্ধু (পৃ. ৭৩৪) বলিয়াছেন, "শ্রীপঞ্চমীতি। তত্র শ্রীপূজা কার্যা।" নির্ণয়সিন্ধুধৃত ব্রহ্মপুরাণের পাঠ একটু বিভিন্ন।

"চতুর্থী বরদা নাম তস্যাং গৌরী সুপূজিতা।
সৌভাগ্যং মঙ্গলং কুর্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি শ্রিয়ম্॥"

মাঘী পঞ্চমীতে শ্রীর পূজার বিধি দিয়াছেন—

"মাঘশুক্লচতুর্থ্যান্তু হর (বর) মারাধ্য চ শ্রিয়ঃ।
পঞ্চম্যাং কুন্দকুসুমৈঃ পূজাং কুর্যাৎ সমৃদ্ধয়ে॥"

বর্ষক্রিয়াকৌমুদী (পৃ. ৪৯৯) প্রাচীন প্রথানুসরণ করিয়া আর একটি ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেটি এই—শ্রীপঞ্চমীর দিন অর্থাৎ মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে 'শ্রীপঞ্চমী-ব্রত' আরম্ভ করিতে হয়। এই ব্রতে ছয় বৎসর প্রতি শ্রীপঞ্চমীর দিন লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়। প্রথম দুই বৎসর পঞ্চমীর দিন লবণ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। তারপর দুই বৎসর ঐ দিন হবিষ্য করিতে হয়। তারপর এক বছর ফল খাইয়া এবং এক বৎসর উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবার নিয়ম।

"শ্রীপঞ্চম্যাং সমারভ্য প্রতিমাসং ষড়ব্দকম্।
পূজয়েৎ সিতপঞ্চম্যাং লক্ষ্মীং সৌভাগ্যসম্পদে॥
অব্দদ্বয়মলবণৈঃ হবিষ্যেণ দ্বয়ং তথা।
ফলেনৈকেন কর্তব্যমুপবাসৈঃ প্রতিষ্ঠয়েৎ॥"

—বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃ. ৪৯৯

পুরাণ-সমুচ্চয় বলেন, মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে প্রথমে রতি ও কামের পূজা করিতে হইবে। তারপরে মহোৎসবের বিরাট্ ব্যাপার করিয়া দানাদি প্রদান করিতে হইবে।

"মাঘমাসে সুরশ্রেষ্ঠ শুক্লায়াং পঞ্চমীতিথৌ।
রতিকামৌ তু সম্পূজ্য কর্তব্যঃ সুমহোৎসবঃ॥
দানানি চ প্রদেয়ানি তেন তুষ্যতি কেশবঃ।

"ইয়মপি শ্রীপঞ্চমীতি প্রসিদ্ধা বসন্তপঞ্চমীত্যেকে"

স্মৃতিসারোদ্ধার (৪র্থ উদ্ধার, পৃ. ৪০) বলেন, ইহার অপর নাম শ্রীপঞ্চমী; বসন্ত-পঞ্চমীও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

সরস্বতী-পূজা

বঙ্গদেশে শ্রীপঞ্চমীর দিন কলা ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবীর পূজা হয়। বৈদ্যনাথ প্রভৃতি বঙ্গের বাহিরের কোন কোন জায়গায়, আশ্বিন শুক্লা অষ্টমীতে সরস্বতীর পূজা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে অপ্রচলিত হইলেও আশ্বিনে সরস্বতী-পূজার শাস্ত্রবিধি আছে। রুদ্রজামলে আছে—

"মূল ঋক্ষে সুরাধীশ পূজনীয়া সরস্বতী।
পূজয়েৎ প্রত্যহং দেব যাবদ্বৈষ্ণবমৃক্ষকম্॥
নাধ্যাপয়েন্ন চ লিখেন্নাধীয়ীত কদাচন।
পুস্তকে স্থাপিতে দেব বিদ্যাকামো দ্বিজোত্তমঃ॥"

চিত্র—৪

পদ্মাসনা সরস্বতী
(লেনিনগ্রাড্ প্রত্নশালায় রক্ষিত)

আশ্বিনের শুক্লপক্ষে মূলা নক্ষত্রে সরস্বতীকে আবাহন করিয়া শ্রবণা নক্ষত্রে বিসর্জন দিতে হয়।* বাঙ্গালা দেশে এ দিন কেহ লেখাপড়া করে না। সরকারী ও সওদাগরী আফিস, স্কুল-কলেজ সব বন্ধ থাকে।

সেকালে স্বরস্বতীর পূজা হইত দুই রকমে—এক দেবীর মৃন্ময় প্রতিমা গড়িয়া, আর, মূর্তি না রাখিয়া—বই, মাটির দোয়াত, শরের কলম, কাগজ ও অন্যান্য সারস্বত প্রতিনিধি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করা হইত। ব্রাহ্মণ ঠাকুর পূজা করিতেন। পূজায় শ্বেত উপচারের ব্যবস্থা। সাদা চন্দন, সাদা ধান, সাদা ফুল। খোয়াক্ষীর, মাখন, দই, খৈ, তিলেখাজা, কুল লাগিত—এগুলিও সাদা। দেবী নিজে শ্বেতবর্ণা—তাঁর বীণা শুভ্র, হস্ত শুভ্র, চক্ষু শুভ্র, বস্ত্রালঙ্কার শুভ্র, পদ্ম শুভ্র। কাজেই তাঁর পূজোপচারে শুভ্র বর্ণের এত বাড়াবাড়ি। দেবীর পূজায় কাঞ্চন ফুলের দরকার হইত; আম্রমুকুল ও অভ্রও দেওয়া হইত। সরস্বতী পূজার দিন পশ্চিমে প্রথম হোলিগান হইয়া থাকে; বোধ হয় তাই থেকে বাঙ্গালা দেশে দেবীর নিকট আবীর দিবার নিয়ম হইয়া থাকিবে। আবীর নহিলে মা সরস্বতীর পূজা হইত না। ঐ দিনে বাসন্তী রঙের গাঁদা ফুলের খুব ব্যবহার ছিল। দেবীর পূজা হইত, আর ছেলেপুলেরা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দেবীর উদ্দেশে অঞ্জলি দিত, আর এক মামুলী বাঙ্গালা কবিতা আওড়াইত। বুড়োরাও বাদ যাইত না। সরস্বতী নিজে স্ত্রীদেবতা; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অঞ্জলি দিতে পাইত না। বাঙ্গালীর বোধ হয় ভয় ছিল, পাছে মেয়েরা দেবীর অনুগ্রহে লেখাপড়া শিখিয়া ফেলে। এই দিন থেকে কুল খাওয়ার আরম্ভ হইত। একটা বিশেষ নিয়ম ছিল, সরস্বতীপূজার দিন "ঢাক বাজিবে না—বাঁশী, কাঁশী, ঢোল," মধুর বাজনা বাজিবে। পূজার পূর্বে "জলসওয়া"র একটা মধুর ব্যাপার ছিল। ছেলেরাও দুটি পয়সা খরচ করিয়া ছোট ছোট সরস্বতী আনিত। পূজার পরদিন ছেলেদের মায়েরা ছেলেদের কল্যাণে "ষষ্ঠী" করিতেন। ষষ্ঠীতে বিধি ছিল—"লোটা বেগুন, গোটা সীম" আর বাড়ির গৃহিণীর জন্য ব্যবস্থা "পান্তা ভাত।" পূজার দিন মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ—ফলাহারই বিধি। পূর্ববঙ্গে এবং অন্য কয়েকটি জায়গায়, বিজয়ার পর হইতে শ্রীপঞ্চমীর আগের দিন পর্যন্ত ইলিশ মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। বোধ হয়, এটি পরোক্ষভাবে জীবরক্ষার আইন।

কলিকাতায় তখনকার দিনে গড়ামূর্তির পূজা কেহ বড় একটা করিতেন না। টোলের অধ্যাপক ও পাঠশালার অধিকারী পণ্ডিত মাত্রেই প্রতিমা আনিয়া পূজা করিতেন।

---

* "আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে মেধাকামঃ সরস্বতীম্।
মূলেনাবাহয়েদ্দেবীং শ্রবণেন বিসর্জনম্॥
মূলাদ্যপাদে চাহ্বানং শ্রবণান্তে বিসর্জনম্॥"—সংগ্রহ [বিধান-পারিজাত (৩য় স্তবক, ৬৩২ পৃ.)।

বন্ধু-বান্ধব ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিমাদর্শনের নিমন্ত্রণ করিতেন। ইহাতে প্রণামী যাহা মিলিত, তাহাতে তাঁহাদের একটা বার্ষিক আয় হইত। সত্তর-আশী বৎসর পূর্বে কলিকাতায় গণিকাদের বাড়িতে কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সরস্বতী-পূজায় বেজায় ধূম হইত।

বসন্ত-পঞ্চমী

শ্রীপঞ্চমীর একটি নাম বসন্ত-পঞ্চমী। শাস্ত্রানুসারে এই দিন হইতে বসন্তকালের আরম্ভ। ছেলেবেলায় বৃদ্ধদের নিকট শুনিয়াছি, তখনকার আমলের কলিকাতাবাসী শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে শাল, দোশালা, রুমাল, বনাত প্রভৃতি শীতবস্ত্র ছাড়িয়া সাদা বা বাসন্তী রঙের উড়ানী প্রভৃতি গ্রীষ্মকালোপযোগী বস্ত্র ব্যবহার করিতে শুরু করিতেন। চল্লিশ বৎসর পূর্বেও আমাদের ছেলেবেলায় এ নিয়ম রদ হয় নাই। আমরা যখন খুব ছোট, তখন বাসন্তীরঙের কাপড়, চাদর, জামা পরিয়াছি। আজও এ রেওয়াজ একেবারে লোপ পায় নাই। বেহারে আজও নর্তকীরা বেশ-বিন্যাস করিয়া বসন্ত-পঞ্চমীর দিন গাড়ি চড়িয়া আমীর ওমরাহদের বাড়ি-বাড়ি 'পুস্কার' (পুরস্কার—ভিক্ষা) আদায় করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস এই দিন ভাল রোজগার হইলে বছর ভাল যাইবে। ছোটনাগপুরে বসন্ত-পঞ্চমীর দিন পূজা হয়, তদুপলক্ষে খুব নাচ গান হয়। উৎসবে একটি মেলাও হয়। মেলার নাম 'দেও'—ইহা ডাল্টনগঞ্জ হইতে ৪২ ক্রোশ। মেলায় হাতী, ঘোড়া, গরুর দৌড় হয়। পালওয়ানদের কুস্তি হয়। আরও কত কি হয়। কিন্তু এখানকার বসন্ত-পঞ্চমী মাঘে নয়—ফাল্গুনে।

সরস্বতী-শব্দের নিরুক্তি

যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে (২. ২৩) সরস্বতী শব্দের দুইটি অর্থ করিয়াছেন, "নদীরূপা" ও "দেবতারূপা"—"......সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।"

১. ৩ ১২ ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ বলিয়াছেন ঃ—

"দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ।"

ঋগ্বেদ আলোচনা করিলে সরস্বতীর উভয় অর্থের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। নিরুক্তকার (৯. ২৬) 'সরস্বতী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—

"সরস্বতী সর ইত্যুদকনাম সর্তেস্তদ্বতী।"

চিত্র—৫

তিব্বতে পদ্মাসনা সরস্বতী
(লাসায় রক্ষিত মূর্তি হইতে)

প্রাচীন ঋষিগণ সরস্বতীর স্তুতি করিতেন। তাঁহারা সরস্বতী বলিলে কি বুঝিতেন? 'সরস্' শব্দের আদিম অর্থ যে 'জল' ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না, তাহা বেদের গোড়ার দিকেব মন্ত্র হইতে বেশ বোঝা যায়। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় বলেন, 'এক্ষণে যে সকল বৈদিক শব্দ অপ্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—তন্মধ্যে 'সরস্' একটি। সরস শব্দের আদিম অর্থ জ্যোতিঃ; এবং তজ্জন্য সূর্যের একটি বৈদিক নাম "সরস্বান্"। সরস্বতী,—অর্থাৎ 'জ্যোতির্ময়ী দেবতা।'* বটব্যাল মহাশয়ের উক্তির সমর্থন-পক্ষে তেমন যুক্তি পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে 'সরস্বৎ' শব্দ তিন বাব মাত্র আছে। দশম মন্ডলে (৬৬. ৫) প্রথমান্ত 'সরস্বান্' এবং অন্যত্র (১. ১৬৪ ৫২; ৭. ৯৬ ৪) দ্বিতীয়ান্ত 'সরস্বন্তম্'। দশম ও সপ্তম মণ্ডলে 'সরস্বৎ' শব্দের অর্থ 'জলাধিপতি। প্রথম মণ্ডলে ইহার অর্থ 'সূর্য'। এখানে সূর্য জলের গর্ভোৎপাদক; সুতরাং ইহার সহিতও জলের সম্পর্ক। কাজেই সূর্যের এই নামের সার্থকতা এ দিক্ দিয়াও থাকিতে পারে। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্-যুগে 'সবস্' শব্দেব অর্থ পরিবর্তিত হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। শতপথ-ব্রাহ্মণে (৭. ৫. ১ ৩১; ১১. ২. ৪. ৯) আমরা দেখি মনকে সরস্বান্ বলা হইয়াছে—'মনো বৈ সরস্বান্'। এটি সরস্বানের আধ্যাত্মিক অর্থ। তারপর দেখি 'স্বর্গো লোকঃ সরস্বান্' (তা-ব্রাঃ, ১৬ ৫.১৫), 'পৌর্ণমাসঃ সরস্বান্' (গোঃ উ, ১. ১২)। স্বর্গলোককে সরস্বান্ বলিলে বুঝাইতে পারে—জ্যোতির্ময় স্বর্গলোক। কেননা, অথর্ববেদে (১০. ২ ৩১) স্বর্গকে বলা হইয়াছে—'স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ', তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে ইহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে—'স্বর্গো লোকো জ্যোতিষাবৃতঃ' (১. ২৭. ৩)। হয়তো এইরূপেই পরযুগে সরস্বতীর একটি পর্যায় হইয়া থাকিবে—'জ্যোতির্ময়ী'। কিন্তু 'সরসের' আদিম অর্থ জ্যোতি নয়।

সরস্বতীতীরে আর্যনিবাস

আর্যদের ভারতাগমন সম্বন্ধে যাহা কিছু উপকরণ একমাত্র ঋগ্বেদ হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু বৈদিক সূক্ত হইতে এ সম্বন্ধে গোড়াকাব খবর কিছুই জানিতে পারা যায় না। আর্যদের ভ্রমণের অতি সামান্য সংবাদই ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া যায়। প্রথমে আর্যরা কাবুল নদের উপত্যকা দখল করেন। শতদ্রু ও পঞ্জাবের ঈশানকোণ পর্যন্ত তাঁহাদের অধিকারে আসিয়াছিল। তখনও তাঁহাবা যমুনা ও গঙ্গানদীর কথা জানিতেন না; যদি বা কিছু জানিতেন তাহা জনশ্রুতিমূলক। কিছুকাল পরে তাঁহারা পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; সরস্বতী নদীর দুই দিকে বাসস্থান নির্মাণ করিলেন এবং ক্রমে গাঙ্গেয় ভূমির শীর্ষদেশ পর্যন্ত অধিকার করিলেন। ঋগ্বেদের সূক্ত হইতে এছাড়া আর বেশি কিছু জানা যায় না। আর্যরা যখন

* সাহিত্য, ৫ম বর্ষ, (১৩০১), পৃ, ৭০৬

কুরুপাঞ্চাল অধিকার করেন তখন ঋগ্বেদের সূক্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আরও কিছু পরে আর্যরা পূর্বপথ ধরিয়া গণ্ডকের দুই দিকে কোশল ও বিদেহ এই দুটি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করেন। পঞ্জাব, কুরুপাঞ্চাল এবং কোশল-বিদেহ—এই তিনটি আর্যভূমি হইয়া দাঁড়াইল। আর এই তিনটি হইতে সমগ্র উত্তর-ভারত আর্যভাবাপন্ন হইতে পারিয়াছিল।

তখনকার আর্যদের সামাজিক গঠন এক নূতন জিনিস ছিল। আর্যদের এক একটি বংশ স্বতন্ত্র থাকিত, বংশগুলির লোকেরা এক সঙ্গে এক অন্নে থাকিত এবং তাহাদের পুরাতন প্রথা বজায় করিয়া চলিত। কয়েক পুরুষ ধরিয়াই এই রকম চলিত। সকলেই অগ্নির পূজা করিত। এই সকল বংশ বড় হইয়া জাতে পরিণত হইত। এই সমস্ত জাতেরা কিন্তু প্রায়ই পরস্পর বিবাদ করিত। তা ছাড়া ইহাদের দুই রকম বহিঃশত্রুও ছিল। ভারতের একটা জাত দল বাঁধিয়া আর্যদের পিছনে লাগিয়াই থাকিত। তাহার উপর দস্যুদের উপদ্রব তো ছিলই।

আর্যগণ যখন সিন্ধুনদ পার হইয়া গাঙ্গেয় ভূমিতে আসেন সেই সময় হইতেই আর্যদের ইতিহাসের আরম্ভ। এই ইতিহাসের কিয়দংশ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। এই ইতিহাসের প্রবর্তন তখন, যখন আর্যগণ সরস্বতী নদীর উভয়কূল অধিকার করিয়া বসেন। পঞ্জাবের নদীসকলের মধ্যে সরস্বতী নদী একেবারে পূর্ব দিকের প্রান্তভাগে প্রবাহিত। এক সময়ে এই খরস্রোতা বিপুলকলেবরা সরস্বতী নদী সিন্ধুরই শাখা ছিল। এই সরস্বতী-তীরে ঋষিরা বাস করিতেন; ইহারই কূলে বহু রাজাও বাস করিয়াছিলেন (ঋক্, ৮. ২১. ১৮)। "পঞ্চজাতা" ইহারই তটে বর্ধিত হইয়াছিল (৬. ৬১. ১২)।

নদীরূপা সরস্বতী

অতি প্রাচীনকালে আর্যগণ কেমন করিয়া কোন্ কোন্ স্থানের মধ্য দিয়া বর্তমান ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখানে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। তবে কয়েকটা কথা বলিয়া না রাখিলে অসুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া আর্যগণের আবর্তের দু-একটি সূত্রের কথা বলিব। বৈদিক আর্যগণ এক সময়ে বর্তমান ভারতের বাহিরে এক নদীতীরে বাস করিয়াছিলেন। সে নদীর উভয় তীর উর্বর ছিল। নদীর জল ছিল স্বাদু, স্বচ্ছ, স্বাস্থ্যপ্রদ। তাহার চতুর্দিকে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সপ্তসিন্ধু (হপ্ত হেন্দু) প্রবাহিত হইত। এই সপ্তসিন্ধু-সমন্বিত ভূমিতে সরস্বতী নদীর তীরে ইরানী ও বৈদিক আর্যগণ বাস করিতেন। বর্তমান অক্সস্ (Oxus) নদের প্রাচীন প্রবাহের সপ্তশাখাই ছিল এই সপ্তসিন্ধু। এইখানেই ইরানী এবং বৈদিক আর্যগণের মনোবিবাদ ও সংঘর্ষ হয়। বোধ হয় তাহারই ফলে অথবা কোন

চিত্র—৬

পদ্ম-সমাসীনা সরস্বতী

(বাগড়ি—দক্ষিণ-ভারত)

নৈসর্গিক বিপৎপাতে বৈদিক আর্যগণ বর্তমান ভারতে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁহারা যে স্থানে বাস করিলেন তাহাতে পাঁচটি নদী মিলিল। পাঁচটি নদীর নাম—**ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা** ও **শতদ্রু**। স্থানও মনের মত হইল; কিন্তু তাঁহাদের সাতের মহিমা মনোমধ্যে বদ্ধমূল ছিল—তাঁহারা তাঁহাদের পূর্বাভ্যস্ত নাম ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের নব বাসভূমিরও নাম রাখিলেন—**সপ্তসিন্ধু**। আরও দুইটি নদী জুটিল, তাহাদের একটির নাম রাখিলেন—সিন্ধু। অপর নদীর উভয় তীরে তাঁহারা বাস করিলেন এবং পূর্বস্মৃতি বজায় রাখিবার জন্য ইহারও নাম দিলেন—"**সরস্বতী**"।

"সপ্ত" এই সংখ্যাটি আর্যদিগের অতি প্রিয় হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা তিন প্রভৃতি সংখ্যার ন্যায় সাতকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন। সপ্তসিন্ধু সাতটি নদী। সাতটি নদীসম্পন্ন প্রদেশও সপ্তসিন্ধু। আর্যদের আবর্তের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলির নাম কিছু কিছু বদলান হইয়াছিল বটে, কিন্তু সংখ্যার মোহ তাঁহারা ছাড়িতে পারেন নাই। সাতকে অনেক স্থলেই তাঁহারা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নদী-সম্পর্কে কোথাও কোথাও সাতের সংখ্যা একেবারেই যে অতিক্রম করে নাই এমন নয়; কিন্তু সাতকে তাঁহারা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। ঋগ্বেদে সরস্বতীর ভগিনীর সংখ্যা কখন সাত হইয়াছে এবং আর্যঋষিগণ প্রার্থনাও করিয়াছেন—

'উত-নরপ্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা।
সরস্বতী স্তোম্যাভূৎ'—৬. ৬১. ১০

সপ্তনদীরূপ সপ্তভগিনীসম্পন্না আমাদের প্রিয়তমা সরস্বতী আমাদের স্তুতিভাজন হউন।

কখন আবার সরস্বতীকে লইয়াই তাঁহারা সাত ভগিনী হইয়াছেন; তাই ত্রিলোক ব্যাপিনী এই "সপ্তধাতু"—সপ্তাবয়বা।* আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া পঞ্চনদ-প্রদেশে সরস্বতী নদীর তীর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এখানে তাঁহারা অগ্নিপূজা দ্বারা তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। এই যুগের বৈদিক সংস্কৃতি বা cultureএর মূল আদর্শ ছিল **অগ্নি-পূজা**। যাহারা অগ্নি-পূজা করিত না তাহারা আর্যসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে নাই। তারপর সরস্বতীর তীর হইতে **বিদেঘ মাথব** ও তাঁহার পুরোহিত **গোতমের** নেতৃত্বে আর্যগণ পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া **সদানীরা** (করতোয়া) পর্যন্ত আর্য-সংস্কৃতি বিস্তার করেন। অপরদিকে আবার আর্যগণ এই সরস্বতীর পুণ্য তীরভূমি হইতে মধ্যভারত পর্যন্ত আর্য-সংস্কৃতি বিস্তৃত করিয়া আর্যসভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন। তখন আবার নূতন করিয়া সপ্তসিন্ধুর নামকরণের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তখন বোধ হয় হরিদ্বারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত সুরেণু,

---

* "ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ............।"—ঋগ্বেদ, ৬.৬১.১২..

পুষ্করের মধ্য দিয়া প্রবাহিত **সুপ্রভা,** হিমালয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত **বিমলোদা,** কুরুক্ষেত্র দিয়া প্রবাহমানা **ওঘবতী,** নৈমিষারণ্য-নদী **কাঞ্চনাক্ষী,** কোশলবাহিনী **মনোরমা** এবং গয়ার স্রোতস্বতী **বিশালা** সপ্তসরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হয়। মহাভারতে এই সপ্তনদীর সমষ্টি সরস্বতী নামে ধ্বনিত হইয়াছে। ক্রমশঃ যখন আর্য-সংস্কৃতি তথা আর্যসভ্যতা দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে, তখন সম্পূর্ণ নূতনভাবে সপ্তসিন্ধুকে বিঘোষিত করিতে হইয়াছিল। তখন উত্তরভারতের সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনার সহিত দক্ষিণ-ভারতের নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরীও মূর্তিমতী পবিত্রতারূপে নূতন অভিধা লাভ করিয়া হিন্দুর পূজার্চনায় ঈরিত হইয়াছিল। তখন হইতে আজ পর্যন্ত সপ্তসিন্ধুকে আহ্বান করিয়া হিন্দু বলে—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

সিবালিক নামক পর্বতশ্রেণী পঞ্জাবের সিরমুর স্টেটের অন্তর্ভুক্ত। উত্তরভারতের সরস্বতী এইস্থান হইতে নির্গত হইয়া আম্বালার অন্তর্গত আদ বদরীর সমতলভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। যে প্রস্রবণে এই নদীর উৎপত্তি সেই প্রস্রবণটি একটি প্লক্ষ তরুর পাদদেশে অবস্থিত ছিল। এই জন্য ইহার নাম "প্লক্ষাবতরণ" বা "প্লক্ষপ্রস্রবণ।" তীর্থ করিবার জন্য লোকে এখানে আসিয়া থাকে।* 'চলোর' গ্রামের নিকট বালুকাভ্যন্তরে সরস্বতী অন্তর্হিত হইয়া পুনরায় ভবানীপুরে আবির্ভূত হইয়াছে। বালছপ্পরে ইহা পুনরায় অন্তর্হিত হইয়াছে। পরে বরঘেরায় আবার দেখা দিয়াছে। পেহোবার নিকট উর্ণই নামক স্থানে ইহা মার্কণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত স্রোত বরাবর সরস্বতী নামে পরিচিত থাকিয়া পরিশেষে থানেশ্বরের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে পাতিয়ালা রাজ্যের পশ্চিমবাহী ঘগ্‌গরের সহিত মিশিয়াছে। বস্তুতঃ ঘগ্‌গর সরস্বতীর নিম্নাংশ।† ঘগ্‌গরকে লোকে প্রাচীন সরস্বতী বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া থাকে, কিন্তু কেমন করিয়া ইহা বর্তমান নামে পরিণত হইল তাহা জানিতে পারা যায় না।‡

উত্তরভারতের সরস্বতী

বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতী নদীর উল্লেখ যথেষ্ট এবং এই নদীর তটভূমি পবিত্র বলিয়া অঙ্গীকৃত। কিন্তু বেদে এই নদীর নির্দেশ সুনিশ্চিত নয়। বহু স্থানে সিন্ধুনদী বুঝাইতে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের নিকট দিয়া

* ঋগ্বেদ, ১০.৭৫ ; মহাভারত, আদি, ১৭২ অঃ ; পদ্ম-পু, স্বর্গ. ১৪ অঃ
† Panjab Gaz. Ambala Dist., Ch., I
‡ J. R. A. S., 1893, p. 51

চিত্র—৭

গদগে পদ্মোপবিষ্টা হংসবাহনা সরস্বতী

প্রবাহিত হইয়া মধ্যদেশ-প্রবাহিত সরস্বতী বুঝাইতে সরস্বতী শব্দের প্রয়োগ বেদের অতি অল্প স্থানেই আছে। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, পারসীদিগের জেন্দ-অবেস্তা গ্রন্থে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চল বা Arachosiaর যে "হরখৈতী" নদীর উল্লেখ আছে, বস্তুতঃ তাহাই মূল সরস্বতী। পরে পঞ্জাবের নদীর নাম সরস্বতী দেওয়া হইয়াছে। সরস্বতী যে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে তাহার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। কিন্তু পরবর্তী যুগের আখ্যান হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইহার ধারা লুপ্ত হইয়া অন্তঃসলিলারূপে প্রয়াগে গিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল।

ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-বচন আলোচনা করিয়া নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, হিমালয় পর্বতের প্লক্ষপ্রস্রবণ হইতে সরস্বতী নদীর উৎপত্তি। সরস্বতী পুণ্যতীর্থ পৃথূদক অর্থাৎ পেহোবা কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশের মহিমা বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে ঝুঁকিয়া দ্বারকার নিকট সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। যখন সরস্বতী অন্তঃসলিলা হয় নাই এবং ইহার বিস্তীর্ণ প্রবলধারার প্রচণ্ড প্রবাহ সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য সবেগে প্রবাহিত হইত, তখন সরস্বতীর ন্যায় বেগবতী প্রকাণ্ড নদী সমগ্র ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় ছিল না। এই সুপ্রসিদ্ধ পুরাতনী নদীর তাৎকালিক মহিমা বেদেও (ঋক্, ৭. ৯৫. ১. ২) সুস্পষ্টভাবে কীর্তিত হইয়াছে।

প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ।
প্রবাবধানা রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিংধুরন্যাঃ ॥ ১
একা চেতৎসরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।
রায়শ্চেতংতী ভুবনস্য ভূরেঘৃতং পয়ো দুদুহে নাহুষায় ॥ ২
আয়ংসাকং যশসো, বাবশানাঃ সরস্বতী সপ্তথ সিংধুমাতা।
যাঃ সুস্বপংত সুদুঘাঃ সুধারা অভিস্বেন পয়সা পীন্যানাঃ।

ইতিহাসের দিক্ দিয়া এই সমস্ত মন্ত্রের বর্ণনা হইতেই ঐ সময়ের সরস্বতীর ইতিহাসের মূল পাওয়া যায়। এই সমস্ত মন্ত্রের অর্থ বিচার করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বহুকাল পূর্বে সরস্বতী অন্তঃসলিলা হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু অন্তঃসলিলা হইবার পূর্বে হিমগিরি হইতে সমুদ্র পর্যন্ত ইহার ধারার প্রবলবেগ অদ্বিতীয় ছিল। এইজন্য সরস্বতীর প্রচণ্ড প্রবাহ বর্ণনায় দেখিতে পাই—শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরস্বতী সুরক্ষিত দুর্গের সুদৃঢ় লৌহদ্বার-স্বরূপ ছিল।

জলবিশেষের নাম তীর্থ। সুপ্রাচীনকালে সরস্বতী সর্বোত্তম তীর্থ ছিল।* সরস্বতীর পবিত্রতার জন্য ইহার তীরে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও দেবতাগণ পূর্বকল্পে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং পুণ্যভূমি ভারতভূমিকে কর্মভূমিরূপে গণ্য করিয়া সরস্বতীর

* গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু সরস্বতীনদীর তীরে এক তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন। বোধ হয় প্রাচীন কালের গান্ধারদেশের সরস্বতীর স্মৃতি তাঁহাকে এই কার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকিবে।

তীরবর্তী ব্রহ্মাবর্ত-প্রদেশকে তপস্যার উপযুক্ত পবিত্রতম ও সর্বোত্তম স্থানরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন।

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তন্দেবনির্মিতন্দেশং ব্রহ্মাবর্তং বিদুর্বুধাঃ॥"—মনু

ব্রহ্মাবর্ত দেবনির্মিত প্রদেশ। ইহাতে প্রথমে যাঁহারা জন্মান তাঁহারা ব্রাহ্মণ। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ভারতবর্ষীয় মনুষ্য মাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। ইহা দ্বারা সরস্বতী ও সারস্বত দেশের মহিমা ঘোষিত হইতেছে।

"ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে।"
ব্রহ্মাবর্তং নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ।
—মঃ পুঃ (আদি)

তৈত্তিরীয়, জাবাল, শতপথ প্রভৃতি শ্রুতিতে সরস্বতীতটস্থ কুরুক্ষেত্রের মহিমা এবং ঐ স্থানে দেবগণ কর্তৃক সম্পাদিত যজ্ঞের সুস্পষ্ট প্রমাণ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কোন স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস নাই যাহাতে সরস্বতী নদী ও তাহার তীরবর্তী কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা করা হয় নাই। মহাভারতের শল্যপর্বে গদাযুদ্ধপর্বের বলদেব-তীর্থ-যাত্রাধ্যায় এবং সারস্বতোপাখ্যানের স্থানে এই সরস্বতী নদী ও কুরুক্ষেত্রের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। বলদেব তীর্থযাত্রার জন্য দ্বারকা হইতে গমন করিয়া সরস্বতীর উৎপত্তিস্থান প্লক্ষ-প্রস্রবণ পর্বতের উপর আরোহণ করেন। তারপর তিনি ঐ পর্বত হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। এই অবতরণের বর্ণনায় "সোবতীর্যাচলশ্রেষ্ঠাৎ প্লক্ষপ্রস্রবণাৎ শুভাৎ" এই কথাটি স্পষ্ট লিখিত আছে! বলদেব স্বয়ং বলিয়াছিলেন—

"সরস্বতীবাসসমা কুতো রতিঃ?
সরস্বতীবাসসম-কুতো গুণাঃ?
সরস্বতীং প্রাপ্যদিব গতা জনাঃ।
সদা স্মরিষ্যন্তি নদীং সরস্বতীম্॥ ১
সরস্বতী সর্বনদীষু পুণ্যা।
সরস্বতী লোকসুখাবহা সদা॥
সরস্বতীং প্রাপ্য জনা সুদুষ্কৃতং।
সদা ন শোচন্তি পরত্র চেহ চ"॥ ২

তারপর ব্যাসদেব মহাভারতে বলদেবের সরস্বতী নদীর প্রতি অনন্যপ্রীতি ও ভক্তির কথা বলিয়াছেন। বলদেব প্রীতির সহিত সরস্বতী দর্শন করিতে করিতে শুভ্রহয়যুক্ত রথে আরোহণ করিলেন।

"তদা মুহুর্মুহুঃ প্রীত্যা প্রেক্ষ্যমাণঃ সরস্বতীম্।
হয়ৈর্যুক্তং রথং শুভ্রমাতিষ্ঠত পরন্তপঃ॥"

যখন ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন নাই, ভাগীরথী গঙ্গা পাপীর উদ্ধারের জন্য

চিত্র —৮

রত্নকুণ্ডলা সরস্বতী
(গঙ্গৈকোন্ড শোলপুরম্—দক্ষিণ-ভারত)

অবতরণও করেন নাই, সেই সুপ্রাচীন কালেও সরস্বতীর পরম পবিত্র তরঙ্গমালার মহিমা বেদাদি শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে। আর জন্মভূমি বিশেষ পবিত্র বলিয়া ঋষিগণ এই দেব-নদীর তীরে আপনাদের আবাসভূমি করিয়াছিলেন।

যে সময় বলদেব তীর্থযাত্রা করিতে গিয়াছিলেন, তাহারও বহু পূর্বে সরস্বতী অন্তঃসলিলা হইয়াছিলেন। কেননা, ঐ তীর্থযাত্রা-প্রকরণে (বন, ৮২ অঃ) দ্বারকা হইতে প্রভাস, চমসোদ্ভেদ, শিরোদ্ভেদ ও নাগোদ্ভেদ এই তিন তীর্থের বর্ণনা আছে। সরস্বতী অন্তর্হিত হইয়া পুনরায় এই তিন তীর্থে প্রকটিত হইয়াছিল। তারপর বিনশন-তীর্থের বর্ণনা আছে, যথা—

"ততো বিনশনং রাজন্ জগামাথ হলয়ুধঃ।
শূদ্রাভীরান্ প্রতিদ্বেষাদ্যত্র নষ্টা সরস্বতী॥
যস্মাৎ সা ভরতশ্রেষ্ঠ দ্বেষান্নষ্টা সরস্বতী।
তস্মাৎ তদৃষয়ো নিত্যং প্রাহুর্বিনশনেতিহি॥"

যেখানে গিয়া সরস্বতী বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই সময় হইতে ঐ দেশের নাম বিনশন হইয়াছে। এই বিনশন-প্রদেশ বর্তমান উদয়পুর, মেবাড় ও রাজপুতানার পশ্চিম প্রান্তভাগের মরুপ্রদেশ। সরস্বতী শিরসা অতিক্রম করিয়া ভটনোর মরুভূমিতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

মনুসংহিতা ও মহাভারতেও শিরসার নিকটে 'বিনশন'-তীর্থে ইহার অন্তর্ধানের কথা আছে।* কিন্তু এইখান থেকে একটি মরা নদীগর্ভের চিহ্ন সিন্ধু (Indus) পর্যন্ত পাওয়া যায়।

এ ছাড়া সরস্বতী সম্পর্কে আমরা আরও কয়েকটি বিষয় দেখিতে পাই। প্রথম, প্রয়াগ-তীর্থে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমকেই লোকে ত্রিবেণী বলিয়া থাকে। এখানে পূর্বদিকে লুপ্ত সরস্বতীর কল্পনা করা হইয়াছে। এমন কি বঙ্গদেশের হুগলীর নিকটে ত্রিবেণীতেও একটি নদীকে সরস্বতী আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। দ্বিতীয়, মহাভারতে বলদেব তীর্থযাত্রায় সরস্বতী লুপ্ত হইবার বর্ণনার পর পুনরায় নৈমিষারণ্য-তীর্থে সরস্বতীনদীর বর্তমান প্রবাহ বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয়, এ ছাড়া পুষ্কর, গয়া, উত্তরকোশল, ঋষভদ্বীপ, গঙ্গাদ্বার, কুরুক্ষেত্র ও হিমালয় পর্বতের উপর ভিন্ন ভিন্ন সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব দেখা যায়।

বর্তমান যুগে গঙ্গার যেমন মাহাত্ম্য পূর্বে সরস্বতীর গৌরব ততোধিক ছিল। সরস্বতী ছিল প্রাচীন আর্যগণের প্রিয়তমা নদী। এ নদীকে তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই। ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত আর্যগণ সরস্বতীর স্মৃতি নদী-বিশেষে জাগরিত রাখিয়াছেন। সপ্তসিন্ধুর স্মৃতিকেও তাঁহারা সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছেন।

* J. R. A. S., 1893, p. 51

এখন কথা হইতেছে, বেদের ঐতিহাসিক অংশে যে সরস্বতী নদীর কথা বলা হইয়াছে, তাহা কোন্‌টি।

পুষ্কর গয়া প্রভৃতি তীর্থে যে যে সরস্বতী আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। দ্বিতীয়তঃ, যজ্ঞকালে ব্রহ্মা বা ব্রহ্মর্ষিগণ মন্ত্রবলে যেখানে যে সময় সরস্বতীর আবাহন করিয়াছিলেন সত্যসঙ্কল্পতার জন্য সেই সমস্ত স্থানে সমতল পৃথ্বী ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাই শাস্ত্রোক্তি। মহাভারতে (শল্যপর্ব, ৩৮ অঃ) ইহাদের এইরূপ নাম দেখিতে পাওয়া যায়—

> "সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিশালা চ মনোরমা।
> সরস্বতী চোঘবতী সুরেণুর্বিমলোদকা ॥ ৪
> পিতামহেন যজতা আহূতা পুষ্করেষু বৈ।
> সুপ্রভা নাম রাজেন্দ্র নাম্না তত্র সরস্বতী ॥ ১৩
> আজগাম মহাভাগ তত্র পুণ্যা সরস্বতী।
> নৈমিষে কাঞ্চনাক্ষী………… ॥ ১৯
> আহূতা পরিতাং শ্রেষ্ঠা গয়যজ্ঞে সরস্বতী।
> বিশালাস্তাং গয়েষ্বাহুঋর্ষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২১
> উত্তরে কোশলাভাগে পুণ্যে রাজন্ মহাত্মনঃ।
> উদ্দালকেন যজতা পূর্বং ধ্যাতা সরস্বতী ॥ ২৩
> আজগাম সরিৎশ্রেষ্ঠা তং দেশং ঋষিকারণাৎ।
> মনোরমেতি বিখ্যাতা…… ……… ॥ ২৫।

মহাভারতের এই বচন হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সুপ্রভা প্রভৃতি সাতটি স্বতন্ত্র নামে আখ্যাত সরস্বতী নদী ভিন্ন ভিন্ন তীর্থে যজ্ঞের সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। এই সাতটি নদী-সংহতির সাধারণ নাম 'সপ্ত-সরস্বতী' বা সপ্তসারস্বত। কিন্তু মহাভারতের মূলে আখ্যাত নদীর নামগুলি গুণিয়া দেখা যায় ইহারা মূল সরস্বতী সমেত নয়টি নদী, কারণ সুরেণু নামে একটি সরস্বতী ঋষভদ্বীপে, আর একটি গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে)।

সুতরাং ইহারা পৃথক্ পৃথক্ সুরেণু। ব্যাসদেব বলেন, হিমালয়ে যখন ব্রহ্মা আবাহন করিয়াছিলেন, তখন সপ্তসরস্বতী পুনরায় একত্র হইয়াছিল। এই সপ্ত-সরস্বতীর মহিমা ব্যাস গাহিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতে এইটুকু স্থির হইতেছে যে, কুরুক্ষেত্রের প্রধান সরস্বতীর অন্য কোন নাম না হইয়া সুপ্রসিদ্ধ সরস্বতী নামই ছিল। কুরুক্ষেত্র পর্যন্ত মহর্ষি বশিষ্ঠ আবাহন করিয়াছিলেন বলিয়া এই পর্যন্ত সরস্বতীর শাখার নাম 'ওঘবতী' হয়। নাম-গণনায়ও ব্যাসদেব মুখ্য সরস্বতী নামটিকে সকল নামগুলির মধ্য স্থানে রাখিয়াছিলেন। আর মুখ্য সরস্বতীর আবাহনও করেন নাই;

চিত্র—৯

হংসবাহনা সারদা (মহীশূর)

কেবল 'আজগাম' এই মাত্র লিখিয়াছেন। এই হিসাবে মুখ্য সরস্বতীকে অপর নামগুলি হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে অন্য নামযুক্ত সাতটি সরস্বতী অবশিষ্ট থাকে। এই সাতটির মধ্যে দক্ষযজ্ঞে সুরেণু নাম্নী দ্রুতগামিনী যে সরস্বতীর নাম পাওয়া যায় তাহাই পরে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হয়; সুতরাং অন্তঃসলিলারূপে যখন প্রয়াগ পর্যন্ত আসিয়া কালিন্দীর সহিত মিলিত হয়, তখন গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ত্রিবেণীসঙ্গম হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। প্লক্ষ-প্রস্রবণ হইতে যে সরস্বতী উৎপন্ন হইয়াছে এবং কাত্যায়ন, লাট্যায়ন প্রভৃতি শ্রৌতসূত্রে যে সরস্বতীনদীতীরে সারস্বতসত্রের দীক্ষা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সর্বপ্রধান সরস্বতীর গতি পূর্বদিকে—অর্থাৎ প্রয়াগ-তীর্থ পর্যন্ত নয়। আবার এরূপ উক্তিও আছে যে, সে সরস্বতী পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

মহর্ষি কাত্যায়ন যে সময়ে "শুক্ল-পক্ষ-সপ্তম্যাং দীক্ষা সরস্বতী বিনশনে" এই সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তখনও সরস্বতী অন্তঃসলিলা ছিল। এই সূত্রের 'বিনশন' শব্দই তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। কর্ক ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"সরস্বতী বিনশনে, সরস্বতী সমুদ্রসঙ্গমে,
সারস্বত-সত্রার্থদীক্ষা ভবতি।"

কিন্তু লাট্যায়নের ১০. ১৫. ১ সূত্রে—

"সরস্বতী নাম নদী প্রত্যক্ স্রোতা প্রবহতি তস্যাঃ প্রাণপরভাগৌ সর্বলোক প্রত্যক্ষৌ, মধমস্তু ভাগঃ ভূম্যন্তর্নিমগ্ন প্রবহতি, নাসৌ কেনচিদ্দৃশ্যতে তদ্বিনশনমুচ্যতে।" ইহা লিখিয়া মাধবাচার্য স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে সরস্বতীর স্রোতঃ-প্রবাহ পশ্চিম দিকে গিয়াছে। এই নদীর প্রথমাংশ ও শেষের অংশ তো সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, কিন্তু মধ্য ভাগ পৃথিবীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া কেহ দেখিতে পাইতেছে না; ইহাকে বিনশন বলে। বিনশন-প্রদেশ নিষাদপুরের পার্শ্ববর্তী দেশের নাম।

"দ্বারং নিষাদরাষ্ট্রস্য যেষাং দোষাদ্ সরস্বতী।
প্রবিষ্টা পৃথিবীং বীর······। —মহাভারত

আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলাম যে, প্লক্ষ-প্রস্রবণ হইতে সরস্বতী নদীর উৎপত্তি। ইহাই বেদোক্ত মুখ্য সরস্বতী মহানদী।* ইহার পূর্বাংশ কুরুক্ষেত্র স্থানুতীর্থে † আজ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে; ইহার লুপ্তাংশ বিনশন-প্রদেশ;

---

* যে নদীর মহিমা শ্রুতিতে কীর্তিত হয়, যে নদীর তীরে মহর্ষিগণ বাস করেন এবং যে নদী ভারতের কোন পর্বত হইতে নির্গত হইয়া স্বাধীনভাবে সমুদ্রে মিলিত হয় তাহাকে মহানদী মধ্যে গণনা করা হয়।

† প্রসিদ্ধি আছে, এইখানে পিণ্ডদানে জীবের সদ্গতি লাভ হয়।

আর ইহার শেষাংশ আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী হইতে উত্থিত পশ্চিম ভারতের সরস্বতী। ইহা উদয়পুরের পশ্চিম-দক্ষিণ সিদ্ধপুর পাটনা অর্থাৎ মাতৃগয়ার নিকট আজও প্রবাহিত হইয়া কচ্ছ ও দ্বারকার নিকটে সমুদ্রের খাড়িতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। পশ্চিম ভারতের হিন্দুরা মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সিদ্ধপুরে আসিয়া থাকেন এবং এই সরস্বতী দর্শন করিয়া যান।

সরস্বতী গঙ্গা প্রভৃতি সাতটি মহানদী প্রধান। বাকী সব নদী। এই সরস্বতী অন্তঃসলিলা হইবার পরও স্বাধীনভাবে সমুদ্রে গিয়া মিলিত হইয়াছে। কিন্তু সুপ্রভা প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরস্বতী দুইশত চারিশত হস্ত প্রবাহিত হইয়া অন্য নদীতে মিশিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটিও স্বাধীনভাবে সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয় নাই।

কুরুক্ষেত্র-সরস্বতী

কুরুক্ষেত্র-সরস্বতীর নাম প্রাচী বা পূর্বসরস্বতী।* কিন্তু পুষ্কর-সরস্বতী সম্বন্ধেই ইহা ঠিক খাটে। লুনি নদীর সহিত যে সরস্বতী পুষ্করহ্রদ হইতে উঠিয়াছে তাহাই পুষ্কর-সরস্বতী।† ইহা কচ্ছের খাড়িতে গিয়া পড়িয়াছে।

প্রভাস-সরস্বতী

গুজরাটের অন্তর্গত সোমনাথের নিকটবর্তী নদীর বর্তমান নাম রোণাক্ষী। ইহা আবুপাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়া অরাসুরের বার্বল্ পাহাড়ে অবস্থিত কোটেশ্বর মহাদেব মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া কচ্ছখাড়ির দিকে গিয়াছে। ইহার নাম প্রভাস-সরস্বতী। স্কন্দপুরাণ (প্রভাসখণ্ড, প্রভাস-মাহাত্ম্য, ৩৫. ৩৬ অঃ) ইহাকে প্রাচী সরস্বতী হইতে অভিন্ন বলিয়াছে। সোমনাথের নিকট এই নদীর তীরে একটি গাছের নিকট শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন।

সরস্বতী

অগ্নিপুরাণ‡ এক সরস্বতীর সংবাদ দিয়াছে। গরবালে অলকানন্দার (গঙ্গার) শাখার নাম সরস্বতী বলিয়া এই পুরাণ নির্দেশ করিয়াছে।

অথর্ববেদের সরস্বতীত্রয়

অথর্ববেদ (৬.১০০) তিনটি সরস্বতী নদীর কথা বলিয়াছেন।

'দেবা অ'দুঃ সূর্যো আদাদ্যোরদাৎপৃথিব্যদাৎ।
তিস্রঃ সরস্বতীরদুঃ সচিত্রা বিষদূষণম্॥
যদ্বো দেবা উপজীকা অসিঞ্চন্ধন্বন্যুদকম্।
তেন দেব প্রসূতেনেদং দূষয়তা বিষম্॥

---

* পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৬৭ অধ্যায়
† পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ১৮ অধ্যায়
‡ অগ্নিপুরাণ, ১০৯ অঃ ১৭ শ্লোক

হংস-বাহনা সরস্বতী
(শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের চিত্রশালায় রক্ষিত)

হংস-বাহনা সরস্বতী
(ব্রিটিশ মিউজিয়ম)

অসুরাণাং দুহিতাসি সা দেবানামসি স্বসা।
দিবস্পৃথিব্যাঃ সংভূতা সা চকর্থারসং বিষম্॥

Ragozin তাঁহার Vedic India নামক পুস্তকে এই তিনটি নদীর স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আফগানিস্তানের Helmand নদীর অবেস্তিক নাম "হরখেবতী"। অথর্ববেদেব তিনটি সরস্বতীর একটি এই "Helmand," একটি পূর্বে সরস্বতী নামে অভিহিত "সিন্ধু" আর একটি "কুরুক্ষেত্রের সরস্বতী"।

বেদে যেমন নদীর কথা আছে, তেমনই নদীব অধিষ্ঠাত্রী দেবতাব কথা আছে। পূর্ব দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিক্ পর্যন্ত বেদ কত নদীরই নাম করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শুতুদ্রী, পরুষ্ণী! তোমরা আমার স্তবগুলি ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী-সংগতা মরুদ্বৃধা নদী! হে বিতস্তা ও সুষোমা-সংগতা আর্জীকিয়া নদী! তোমরা শোন।

হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে। ক্রমে সুসর্তু, রসা ও শ্বেতীর সঙ্গে মিলিলে। তুমি ক্রুমু ও গোমতীকে—কুভা ও মেহৎনুর সঙ্গে মিলিত করিলে। এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে (এক সঙ্গে) গমন করিয়া থাক।

"ইয়ং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়েশৃণুহ্যা সুষোময়া॥
তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেতাত্যা।
ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহৎন্বা সরথং যাভিরীয়সে॥ ১০. ৭৫. ৫. ৬

কিন্তু সকল নদীর মধ্যে সরস্বতীর কথা সকলের চেয়ে বড় করিয়াই বলা হইয়াছে। ঋষিদের মনে সকল সময়েই নদীর সঙ্গে নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী জাগিয়া উঠিত। তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই সরস্বতী বলিতে সরস্বতী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই বুঝিতেন। সরস্বতী শুভ্রবর্ণা (ঋক্, ৭. ৯৫ ৬; ৭. ৯৬ ৩)। তিনি ভীষণ হিরণ্ময় রথে আরূঢ়া—

'উত স্যানঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনি'—ঋক্, ৬ ৬১. ৭

কিন্তু তিনি সকল সময়েই কল্যাণী (ঋক্, ৭. ৯৬. ২)। বৈদিক আর্যেরা সরস্বতী নদীতীরে বাস করিতেন এবং দেবী সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করিতেন যেন তাঁহারা চিরকাল সেখানে বাস করিতে পারেন। তাঁহারা দেবীর নিকট কত কথাই বলিতেন। কখন বা তাঁহাদের রসনা হইতে স্ফুরিত হইত—

'জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা ত্বৎক্ষেত্রাণ্যরণানি গন্ম।'—ঋক্, ৬. ৬১. ১৪

তুমি আমাদের সখিত্ব ও গৃহ স্বীকার কর, আমরা যেন তোমার নিকট হইতে অপকৃষ্ট স্থানে গমন না করি।

ঋগ্বাণী সরস্বতীকে 'অপসাম্ অপস্তমা' (৬ ৬১. ১৩) বলিয়াছেন। শুধু তাহাই

নয়, তাঁহাকে মাতৃগণের মধ্যে, নদীগণের মধ্যে, দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া কীর্তিত করিয়াছেন।

"অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।"—২. ৪১. ১৬

যে সমস্ত আর্যজাতি ভারতে প্রথম আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পুরুগণ অন্যতম। দস্যুদের সঙ্গে সংঘর্ষে পুরুদের যশ সকলের চেয়ে বেশি ছিল। পুরুরা সরস্বতী নদীর উভয় তীরে বাস করিতেন (৭. ৯৫ ৯৬)। তারপর ভরতরা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া সরস্বতী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে আসিয়া তাঁহারা কিছুকাল সরস্বতীর তীরে বাস করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহারা যেমন অগ্নির পূজা করিতেন, তেমনই 'ভারতী' নামে আর এক দেবীরও উপাসনা করিতেন। তাঁহারা সম্ভবতঃ তাঁহাদের জাতি নামে তাঁহাকে সম্বোধিত করিয়া 'ভারতী' আখ্যা দিয়াছিলেন। অতঃপর ভরতদের পুরুদের সঙ্গে সরস্বতী তীরেই যুদ্ধ হয়। শেষে তাঁহারা সরস্বতী পার হইয়া কুরুক্ষেত্রে থাকিলেন। শেষে ভরতরা কুরুপাঞ্চালদের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

নহুষ সরস্বতী-কূলে যজ্ঞ প্রার্থনা করিতেন। ঋষিরা যে সরস্বতী-তীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহা ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে সমর্থিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে পাই—দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরস্বতী-তীরস্থ মনুষ্য গৃহে অগ্নি ধনবিশিষ্ট হইয়া দীপ্ত হইত (৩. ২৩. ৪)। বেদে ঋষিরা নানাভাবে সরস্বতীর স্তুতি করিয়াছেন। সরস্বতীকে অন্য দেবতার সঙ্গেও স্তব করা হইত। পূষা, ইন্দ্র, মরুদ্‌গণের সহিত তাঁহাকে স্তুতি করা হইত। তিনি ছিলেন ইঁহাদের সখী। অশ্বিগণ একবার নিজশক্তি ও অদ্ভুত কার্য দ্বারা ইন্দ্রের সহায়তা করেন। তখন সরস্বতী দেবী ইন্দ্রের নিকট ছিলেন (ঋক্, ১০. ১৩১. ৫ = শুক্লযজুঃ, ১০. ৩৪)। শুক্লযজুর্বেদ বলেন—সরস্বতী 'অশ্বিভ্যাং পত্নী' অশ্বিদ্বয়ের পত্নী (১৯. ৯৪)। শুক্লযজুর্বেদের অন্যান্য স্থানেও* সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। এই যজুর্বেদে (১৯. ১২) একটি আখ্যায়িকা আছে। "দেবা যজ্ঞমতন্বত ভেষজং ভিষজাশ্বিনা। বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াণি দধতঃ।" দেবতারা এক যজ্ঞ করেন। তাহাতে অশ্বিদ্বয় ভিষগ্‌রূপে এবং সরস্বতী "বাচা"—ত্রয়ীলক্ষণা বাক্ সাহায্যে ইন্দ্রের বীর্য-সামর্থ্য সমাধান করিয়াছিলেন এখানে আমরা প্রথম বাকের (বাক্যের) সহিত সরস্বতীর সম্পর্ক দেখিতে পাই। যখন তিনি বাক্যদ্বারা ইন্দ্রের বলাধান করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে 'বাগ্দেবী' বলা যাইতে পারে। এই বাক্ কে? ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে দেবী বাক্ নিজেই নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি। আমি আদিত্য প্রভৃতি সকল দেবতাগণের সঙ্গে থাকি। আমি মিত্র ও বরুণকে ধারণ করি? আমি ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি।

---

* ১৯, ১২, ১৫, ১৮, ৩৪, ৮০-৮৩, ৮৮-৯০, ৯৩-৯৫ ; ২০, ৫৬-৬৯, ৭৩-৭৬, ৯০

চিত্র—১১

ময়ূরবাহনা সরস্বতী

(শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের চিত্রশালায় রক্ষিত)

আমি রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

দেবতা ও মনুষ্যগণ যাঁহার শরণাগত হয়, তাঁহার বিষয় আমিই উপদেশ দিয়া থাকি। যাহাকে মনে করিব—আমি বলবান্, স্তোতা, ঋষি বা বুদ্ধিমান্ করিতে পারি ॥ সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার অবস্থান ইত্যাদি।

আমরা পূষার সহিত, ইন্দ্রের সহিত, অশ্বিদ্বয়ের সহিত, অন্য দেবতার সহিত সরস্বতীকে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। বাক্ ও সরস্বতী উভয়েরই জলে অবস্থান। তারপর অন্যান্য গুণ উভয়েরই প্রায় সমান। এক্ষেত্রে পরে উভয়ের অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। বোধ হয় এই জন্যই ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৩ পঞ্চিকা ১১ অধ্যায়) স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—বাক্যই সরস্বতী। শতপথ-ব্রাহ্মণও (৩. ৯. ১. ৭) ঈরিত করিয়াছেন—

"বাগ্বৈ সরস্বতী"

বাক্ শক্তিরূপে পরিচিতা। সরস্বতীকে অন্তরীক্ষের বাক্ বলা হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের কোন স্থানে এমন উক্তি নাই যাহা দিয়া দেখান যাইতেছে যে সরস্বতী নদী দেবতা ব্যতীত আর কিছু। কিন্তু ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের সময় সরস্বতী ও বাক্ অভিন্না হইয়াছেন। তাই ব্রাহ্মণ ও বৃহদ্দেবতায় সরস্বতীই বাক্ বলিয়া পরিকল্পিত। ব্রাহ্মণসাহিত্যের পূর্বে বাক্ ও সরস্বতী পৃথক্ দেবতা ছিলেন।

অম্ভৃণ ঋষির বাক্ নামে এক কন্যা ছিলেন। ইনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মবিদুষী হন। ঋগ্বেদের বাগম্ভৃণী ঋকে "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি" ইত্যাদি সূক্তে ইঁহারই ব্রহ্মদর্শনের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। এই সূক্তটি দেবীসূক্ত নামে কথিত এবং বঙ্গদেশের শক্তিপূজার বৈদিক মূল ইহাতেই নিহিত।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের "বাগ্ বৈ সরস্বতী" এবংবিধ উক্তি হইতে উপরোক্ত অম্ভৃণ-দুহিতাকেই কেহ কেহ সরস্বতী মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (৫ম ব্রাহ্মণ) আদিত্য অম্ভৃণীকে শুক্লযজুর্বেদ শিক্ষাদান করেন ; আর বাক্ অম্ভৃণীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। "বাগ্ বৈ সরস্বতী" এই বাক্যে বাক্যমাত্রেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে বাক্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যে শক্তি বাক্যের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়, তিনিই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী। এই দেবীকে যিনি পাইতে চাহেন, তিনি বাক্যকেই সেই সরস্বতীরূপে উপাসনা করিবেন, ইহা বলাই "বাগ্ বৈ সরস্বতী" এই মন্ত্রাংশের তাৎপর্য। বাক্য ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কার্যকারণরূপ সম্বন্ধবশতঃ তত্ত্বতঃ অভিন্ন ; এই জন্য বাক্যেরই নামান্তর বাণী, ভারতী, সরস্বতী বাক্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামও উহাই। বেদে বাক্‌কে ধেনুরূপে উপাসনা করিবার বিধি দেখা যায়—"বাচং ধেনুমুপাসীত।" ধেনু যেমন অভীষ্ট দুগ্ধ দান করে, তেমন বাক্যকে ধেনুরূপে উপাসনা করিলে সেও অভীষ্ট ফল প্রদান করিবে।

ধেনুর ন্যায় বাক্যের চারিটি স্তন—স্বাহাকার, স্বধাকার, বষট্কার, হন্তকার, এই চারিটি স্তনের মধ্যে যেটির উপাসনা করিবে, তদ্রূপ ফল লাভ হইবে। বেদে আরও অনেক প্রকারে বাক্যকে উপাসনা করিবার বিধি দেখা যায়। সেইরূপ "বাগ্ বৈ সরস্বতী" এই মন্ত্রাংশের তাৎপর্যও বাক্যকে সরস্বতীরূপে উপাসনা করা। ইহা দ্বারা অম্ভৃণ দুহিতা বাক্‌কে সরস্বতী বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই।

আমরা দেখিতে পাই সরস্বতীর একটি নাম "ভারতী।" কিন্তু তাঁহার এই নামের কোন প্রকৃষ্ট হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আপ্রী ও আপ্রসূক্তে (১. ১৪২. ৯ ; ১. ১৮৮. ৮ ; ২. ১. ১১ ; ২. ৩ ৮ ; ৩ ৪. ৮ ইত্যাদি) যজ্ঞদেবতা দেবীত্রয়ের কথা আছে। এই দেবীত্রয় ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী। পরে ভারতী ও সরস্বতী অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকিবে। ভরতরা যে যজ্ঞপরায়ণ জাতি ছিল তাহা ঋগ্বেদের—"শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ ভারতাগ্নে দ্যুমন্তমা ভর" (২. ৭. ১) প্রভৃতি ঋকের "ভারতাগ্নি" শব্দে প্রমাণিত। আর ভরতরা যে যজ্ঞশীল ছিল, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (২. ২৫ ; ৩. ১৮), শতপথ-ব্রাহ্মণ (৫ ৪. ৪ ১), তৈত্তিরীয়-আরণ্যক (১. ২৭. ২), পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ (১৪. ৩ ১৩ ; ১৫. ৫ ২৪) তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। দেবশ্রবা, দেববাত নামক দুইজন ভরতদের রাজাকেও সরস্বতী, আপয়া ও দৃষদ্বতীতীরে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভরতরা, বোধ হয় যখন সরস্বতী-তীরে যজ্ঞ করিতেন, তখন যজ্ঞ-দেবতার নাম, 'ভারতী' রাখিয়া থাকিবেন।

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া আমরা পাই যে—বাক্, ভারতী ও সরস্বতী অভিন্না।

দেবীত্রয়

প্রধান যাগের পূর্বে কতকগুলি যাগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপ অনুষ্ঠেয় যাগের বৈদিক নাম 'প্রযাজ'। ইষ্টিযজ্ঞে এই রকম প্রযাজ পাঁচটি, পশুযাগে এগার। এগারটি প্রযাজে এগার জন দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। এই যাজ্যামন্ত্রের নাম 'আপ্রীমন্ত্র,' আর এই এগার জন দেবতাকে বলে 'আপ্রীদেবতা'। একাদশ আপ্রী-দেবতার নাম—ইড়, ত্বষ্টা, দেবীত্রয় (ইড়া, ভারতী, সরস্বতী), উষাসানক্তা, তনূনপাৎ, দৈব্যহোতারা, নরাশংস, বর্হিঃ, বনস্পতি, সমিৎ ও স্বাহাকৃতি। অষ্টম প্রযাজের দেবতা, ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী। এই প্রযাজে এই তিন দেবীর যজন হয়।* ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১০ সূক্ত আপ্রীসূক্ত। ইহার ৮ম ঋক্ ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী,—এই দেবীত্রয়ের মন্ত্র। এই মন্ত্র উপদেশ করে—

"আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিড়ামনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু॥"

---

* ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, ২য় পঞ্চিকা, ৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

চিত্র—১২

মযূরবাহনা সরস্বতী—বসৌলী
(ঘোষ সংগ্রহ)

দেবী ভারতী শীঘ্র আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন ; মনুষ্য যেমন আগমন করে, তেমনই দেবী ইড়া এই যজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়া আগমন করুন। তাঁহারা দুই জন এবং সরস্বতী চমৎকার কর্মকারিণী, এই তিন দেবী আগমন করিয়া সম্মুখের সুখপ্রদ কুশাসনে উপবেশন করুন।

ইড়া ও ভারতী বৈদিক সরস্বতীর নিত্যসহচরী। সরস্বতীসূক্ত বাদ দিয়া অন্যান্য সূক্তের ৪০টি মন্ত্রে সরস্বতীর স্তুতি আছে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ মন্ত্রেই সরস্বতীর সঙ্গে ইড়া ও ভারতীর নাম পাওয়া যায়। আচার্য সায়ণ (১. ১৩. ৯) ঋগ্‌ভাষ্যে বলেন. "ইড়াদিশব্দাভিধেয়াঃ বহ্নি-মর্ত্তয়স্তিস্রঃ"—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অগ্নির তিনটি শিখা বা মূর্তি-বিশেষ। তিনি (১. ১৮৮. ৮) ঋগ্‌ভাষ্যে বলিয়াছেন. ইড়া, পৃথিবীসম্বন্ধিনী, ভারতী আদিত্যসম্বন্ধিনী এবং সরস্বতী দ্যুলোকসম্বন্ধিনী বাগ্‌দেবী। তিনি আবার (১ ১৪২. ৯) ঋগ্‌ভাষ্যে বলিয়াছেন, এই দেবীত্রয় আদিত্যেরই প্রভাবিশেষ। অন্যত্র (১. ১৩ ৯) ঋগ্‌ভাষ্যে বলিয়াছেন, ইড়া বিষ্ণুপত্নী পৃথিবী, ভারতী ভারতপত্নী এবং সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ এই তিন দেবী সম্পর্কে বলিয়াছেন,—প্রাণ, অপান ও ব্যানই এই তিন দেবী।

ঋগ্বেদের একটি ঋকে (১. ১. ৪২. ৯) ইড়া, ভারতী, মহী ও সরস্বতী, এই চারি দেবীর নাম একসঙ্গে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। তিনটি (১. ১৩. ৯ ; ৫. ৫ ৮ ; ৯৫ ৮) ঋকে আবার ভারতীকে বাদ দিড়া ইয়া, সরস্বতী ও মহী এই ত্রিদেবীর স্তব করা হইয়াছে। শুক্লযজুর্বেদে (২৮. ৮) এই দেবীত্রয়কে ইন্দ্রপত্নী বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে।

ইড়া, ভারতী, সরস্বতী ক্রমশঃ অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে দেবী সরস্বতীতে সকলের গুণ আরোপিত হইল। দেবী সরস্বতী প্রধানা হইলেন। ভারতবাসী বৈদিক যুগ হইতে এই সরস্বতীর আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। আজও সমগ্র ভারত তাঁহার ভক্ত। বৈদিক দেবদেবী সম্মানে, পূজায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সরস্বতী সুদূর বৈদিককাল হইতে আজ পর্যন্ত সমভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

সারস্বত-সত্র

বৈদিক যুগের ঋষিরা, রাজারা এবং সাধারণ লোকেরা সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করিত। আর সে সময় পাঁচটি জাতি সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিত। "পঞ্চজাতা বর্ধয়ন্তী" (৬. ৬১. ১২) সরস্বতীর বরে তাহারাও বড় হইয়া উঠিল। পাঁচটি জাতির উল্লেখ আমরা অনেকবার বেদে পাইয়াছি। তাঁহাদিগকে বেদে "পঞ্চজাতাঃ,' 'পঞ্চজনাঃ,' 'পঞ্চজনয়ঃ.' 'পঞ্চকৃষ্টয়ঃ' প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই পঞ্চজাত যে কাহারা, তাহা লইয়া অনেক তর্ক আছে। কেহ বলেন, তাঁহারা গন্ধর্ব, পিতৃ, দেব,

অসুর ও রাক্ষস। কেহ বলেন, তাঁহারা চারি জাতি ও নিষাদ। কেহ আবার অন্য রকমও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে বৈদিক উক্তির সঙ্গতি আদৌ হয় না। বেদে কয়েক জায়গায় পাঁচটি জাতির নাম একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পাঁচটি জাতি—অনু, দ্রুহ্যু, পুরু, তুর্বসু ও যদু। খুব সম্ভব ইহারাই পঞ্চজাতা। ইহাদের পুরোহিত ছিলেন ঋষি 'অত্রি'। ইহারা অগ্নি, সোম, মিত্র, ইন্দ্র ও সরস্বতীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিত। আবার বেদে পাওয়া যায়, "পঞ্চজনয়া বিশা" (৮. ৫২. ৭) ইন্দ্রকে আহ্বান করিত, ইন্দ্র ছিলেন 'সৎপতিঃ পঞ্চজনয়ঃ' (৫. ৩২. ১১) ; অগ্নি ছিলেন 'পঞ্চজনয়ঃ পুরোহিতঃ' (৯. ৬৬. ২০) ; বেদে (১ ১১৭ ৩) অত্রিকে বলা হইয়াছে 'ঋষিং পঞ্চজনয়ম্'। এই পঞ্চ জাতি সরস্বতীর অতিপ্রিয় ভক্ত ছিল।

ঋষিরা সরস্বতীর উপাসনা করিতেন, তাঁহার তীরে যজ্ঞ করিতেন। ক্রমে তাঁহারা সরস্তীর জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যে স্থানে সরস্বতী বালুকামধ্যে লুপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম হইল 'বিনশন'। এই বিনশনের দক্ষিণ কূলে ষষ্ঠী তিথিতে সারস্বত-সত্রের ব্যবস্থা ঋষিরা করিলেন। লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্র (১০. ১৫. ১) উপদেশ করিলেন,—"দক্ষিণে তীরে সরস্বত্যা বিনশনস্য দীক্ষেরন্ সারস্বতায় ষষ্ঠ্যাং পক্ষসোতি গৌতমঃ।" এই সারস্বতসূত্রে পত্নীশালা, শামিত্র, সদঃশালা, আগ্নীধ্র, সমস্তই চক্রাকার করিয়া তৈরি করা হইত।

সদো যজ্ঞাগারং চক্রীবদাকারং ভবতি।—শা, শ্রৌ-সূত্র ১৩. ২৯. ৭

আগ্নীধ্রমপ্যাগারং তথৈব চক্রীবদাকারং ভবতি।—১৩. ২৯. ৮

উলূখলবুধ্নাকারো যূপো ভবতি।—১৩. ২৯. ৯

এই সারস্বত-সত্রে সরস্বতীর জন্য একটি 'মেষী' বলি দিবারও ব্যবস্থা হইল। এই বলি সৌত্রামণীযাগেই বিহিত হইল। শাংখায়ন ব্যবস্থা দিলেন—

"তস্য সৌত্রামণস্যাশ্বিনঃ পশুর্লোহিতেন বর্ণেন বিশিষ্টঃ সারস্বতী চ মেষী ইত্যেতৌ পশূ উপালম্ভৌ সবনীয়স্য।—১৩. ১৩. ১

নানা দেবতার নিকট অনেক রকম বলির ব্যবস্থা আছে। ইন্দ্রের নিকট গো ও মহিষ বলি দেওয়া হয় (শতপথ-ব্রা, ৫. ৫. ৪. ১)। অশ্বমেধযজ্ঞে সোম ও পূষার নিকট ধনধূসর বর্ণের ছাগ (শতপথ-ব্রা, ১৩. ২. ২. ৬) ; অগ্নির নিকটও ছাগ—তবে তার ঘাড়টি কাল হওয়া চাই (ঐ, ১৩. ২ ২. ৩) ; অশ্বিদ্বয়ের নিকট লোহিত ছাগ, তবে নীচের দিক্‌টা কাল (ঐ, ১৩. ২. ২. ৫) ; বায়ু ও সূর্যের নিকট সাদা ছাগ, যমের বলিতে কৃষ্ণছাগের প্রয়োজন (ঐ, ১৩. ২. ২. ৭)। বিশেষ লোমশ উরুযুক্ত ছাগ না হইলে ত্বষ্টার বলি হইবে না (ঐ, ১০. ২. ২. ৪)। সরস্বতীর সাধারণতঃ মেষী—ছাগ হইলেও চলে (ঐ, ১৩. ২. ২ ৮)।

চিত্র—১৩

মেষবাহনা সরস্বতী
(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রত্নশালায় রক্ষিত)

চিত্র—১৪

মেষবাহনা সরস্বতী
(বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি—রাজশাহী)

চিত্র—১৫

ক

সিংহবাহিনী সরস্বতী (সোভনাথ—বোধগয়া)

খ
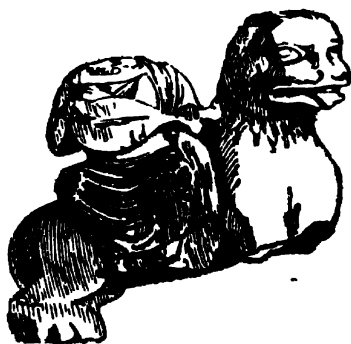
সিংহবাহনা সরস্বতী (গান্ধার)

কৌষীতকি, আশ্বলায়ন, লাট্যায়ন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে এই সমস্ত বিধির অনুমোদন করিলেন।

সরস্বতীযাগ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগ্রন্থে অনেক আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

সোমক্রয়ে সরস্বতী

সোমযাগে সোম না হইলে চলে না। এই সোমকে বৈদিক সাহিত্যে রাজা বলিয়া বর্ণনা করাও হইয়াছে। একটা প্রাচীন প্রবাদ ছিল যে, দেবতারা রাজা সোমকে পূর্ব-দিকেই ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহা হইতে নিয়মই হইয়া গেল যে, ঋত্বিকেরা প্রাচীন বংশের পূর্বদিকেই সোমক্রয় করিবে [ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, তৃতীয় অধ্যায়]। যাহা হউক, রাজা সোম গন্ধর্বদের নিকট ছিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাদের নিকট সোমকে আনিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেখানে বাগ্‌দেবী বাক্ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, দেখ, গন্ধর্বেরা স্ত্রীকামী; আমাকেই তোমরা সোমের মূল্যস্বরূপ কর। দেবগণ কিন্তু বাক্‌কে ছাড়িয়া থাকিতে রাজী নন। তখন বাগ্‌দেবী বলিলেন, তোমরা আমাকে দিয়াই সোম ক্রয় কর; যখনই তোমাদের দরকার হইবে, তখনই আমি তোমাদের নিকট আসিব। অগত্যা দেবতারা তাহাতেই সম্মত হইলেন। বাগ্‌দেবী মহতী নগ্নরূপধারিণী হইয়া গন্ধর্বদিগের নিকট গমন করেন, তবে তিনি অগ্নিপ্রণয়নের সময় পুনরায় ফিরিয়া আসেন [ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, ৫ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড]। তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৬. ১৬. ৫', মৈত্রায়ণী-সংহিতা (৩. ৭. ৩) ও শতপথ-ব্রাহ্মণে আখ্যানটি রূপান্তরিত। শতপথের আখ্যানটি এই,—

শতপথ-ব্রাহ্মণ বলেন (৩. ৫. ১. ১৩)—পূর্বে আদিত্যগণ ও অঙ্গিরোগণই ছিলেন। অঙ্গিরোগণ প্রথমে যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁহারা আয়োজন শেষ করিয়া তার পরদিন আসিয়া যজ্ঞ করাইবার জন্য অগ্নিকে তাঁহাদের আহ্বান করিতে পাঠাইয়া দিলেন। আদিত্যগণ কিন্তু পরামর্শ করিল যে, তাঁহারা অঙ্গিরোগণের নিকট যাইবেন না, বরং তাঁহারাই তাঁহাদের নিকট আসিবেন। তাঁহারা সোমযাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তাঁহারা সেই দিনই যজ্ঞের আয়োজন করিয়া অগ্নিকে বলিলেন, আজই আমরা যজ্ঞ করিব, ইহা আপনি ও অঙ্গিরোগণ জানিয়া রাখুন। তবে আপনাকে আমাদের যজ্ঞের হোতা হইতে হইবে। আদিত্যগণ অন্য কাহাকে দিয়া অঙ্গিরোগণকে সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহারা অগ্নির উপর বেজায় চটিয়া গেলেন। অগ্নি বলিলেন, তিনি কি করিবেন, নিরপরাধ আদিত্যগণ তাঁহাকে বরণ করিলেন, তিনি তাঁহাদের কথা ফেলিতে পারিলেন না। অগত্যা অঙ্গিরোগণ উপায়ান্তর নাই দেখিয়া আদিত্যগণকে যজ্ঞ করাইলেন। আদিত্যগণ দক্ষিণাস্বরূপ দিবার জন্য বাক্‌কে আনয়ন করিলেন। অঙ্গিরোগণ বাক্‌কে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না; বলিলেন, ইঁহাকে গ্রহণ করিলে আমাদের ক্ষতি হইবে। কিন্তু দক্ষিণা ব্যতীত যজ্ঞ পূর্ণ হইবে

না। কাজেই তাঁহারা সূর্যকে আনিলেন, অঙ্গিরোগণ সূর্যকে দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বাক্ বড়ই রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, সূর্য কোন্ গুণে আমার চেয়ে বড় যে, তাঁরা আমাকে গ্রহণ না করিয়া সূর্যকে গ্রহণ করিলেন? এই কথা বলিয়া তিনি ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। আদিত্যগণ বলিলে দেবতাদের বোঝায়, অঙ্গিরোগণ অসুর। বাক্ ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহীরূপ ধারণ করিলেন।* দেবাসুরদের মধ্যে যাহা কিছু সম্মুখে পাইলেন, তাহাই নষ্ট করিতে লাগিলেন। দেবাসুরেরা অস্থির হইয়া পড়িলেন। দেবতাদের পক্ষ হইতে অগ্নি এবং অসুরদের পক্ষ হইতে সহরক্ষ দূতরূপে প্রেরিত হইলেন। বাকের ইচ্ছা, দেবতাদের নিকট ফিরিয়া যান। তাই তিনি দেবতাদের বলিলেন, তোমাদের নিকট গিয়া আমার লাভ কি? দেবগণ বলিলেন, তিনি এমন কি, অগ্নিরও আগে যজ্ঞাহুতি পাইবেন। তখন বাক্ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণেরই নিকটে গমন করিলেন।

সোম ছিলেন দিব্যধামে, আর দেবতারা ছিলেন এই পৃথিবীতে। দেবতাদের ইচ্ছা হইল, সোম তাঁহাদের নিকট আসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যজ্ঞের সুবিধা হইবে। গায়ত্রী সোম আনিবার জন্য আকাশে ছুটিলেন। সোম লইয়া যখন তিনি আসিতেছিলেন, তখন গন্ধর্ব বিশ্বাবসু তাহা অপহরণ করিলেন। দেবগণ সমস্ত সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, গন্ধর্বেরা স্ত্রীকামুক; বাক্‌কে তাহাদের নিকট পাঠান যাক্, তিনি সোম লইয়া আমাদের নিকট আসুন। বাক্ প্রেরিত হইয়া গন্ধর্বদের নিকট হইতে সোম লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। গন্ধর্বগণ পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া বলিল, 'সোম তোমাদের, বাক্ কিন্তু আমাদের।' দেবগণ বলিলেন, আচ্ছা তাই হউক, তবে বাক্ যদি এখানে আসেন, তোমরা জোর করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইও না; এস, আমরা উভয়েই তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করি। তাহাই হইল। গন্ধর্বেরা তাঁহার নিকট বেদপাঠ করিতে লাগিল। দেবগণ বীণার সৃষ্টি করিয়া বসিয়া বসিয়া বীণা বাজাইয়া ও গান করিয়া তাঁহাকে প্রমোদিত করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, আমরা তোমারই গান করিব, তোমাকেই প্রমোদিত করিব। সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধা বাক্ দেবগণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।—এইরূপে বাক্ ও সোম দেবতাদের নিকট রহিলেন (শতপথ-ব্রাহ্মণ, ৩. ২. ৪. ১.—৬)।

এই আখ্যানটি তৈত্তিরীয়-সংহিতা ও ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে আছে। কিন্তু অতি সামান্য ও অন্যরূপ। তৈত্তিরীয়-সংহিতা বা ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বীণার কোন উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ-যজুর্বেদ বা তৈত্তরীয়-সংহিতায় বাকের বীণার কথা আছে। একবার বাক্ যজ্ঞের কার্যে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়া দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া যান। বৃক্ষস্থিত শব্দরূপা বাক্ই দুন্দুভি, বীণা ও তূনবের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। নৈঘণ্টুকে (৫. ৫; নিরুক্ত ১১. ২৭) বাক্‌কে অন্তরীক্ষ-দেবতাদিগের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

* জৈমিনীয়-ব্রাহ্মণেও (৩. ১৮৭) সিংহীরূপ ধারণের কথা আছে।

চিত্র—১৬

সিংহারূঢ়া বাগীশ্বরী
(কলিকাতা-প্রত্নশালায় রক্ষিত)

আর নিরুক্তে আমরা পাই, বজ্রই অন্তরীক্ষদেবতা বাক্। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণের (১২. ২) 'সরস্বতীতি তদ্দ্বিতীয়ং বজ্ররূপম্' এই উক্তি নিরুক্তসিদ্ধান্তের বীজ বলিয়া মনে হয়।

সরস্বতীর বলি

শতপথ-ব্রাহ্মণে সরস্বতীর বলি কেমন করিয়া হইল, সে সম্বন্ধে একটি আখ্যান আছে, তাহা এইরূপ ঃ—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ। ইন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বরূপের বিবাদ ঘটে, ফলে ইন্দ্র বিশ্বরূপকে নিহত করেন। বিশ্বরূপ হত হইলে ত্বষ্টা ইন্দ্রের উপর খুব চটিয়া গেলেন। ইন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য আশ্চর্য যাদুশক্তিসম্পন্ন সোমরস তিনি আনয়ন করিলেন।* ইন্দ্র কিন্তু তাহা পান করিবার জন্যই বড় উৎসুক হইলেন। তিনি যজ্ঞার্থ আনীত ত্বষ্টার এই সোমরস জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া সমস্ত পান করিলেন। কাজটা ভালো হইল না; তাহাতে যজ্ঞ পণ্ড হইয়া গেল। আর তাহা ন করিতে না পারেন, তাহারও তিনি ব্যবস্থা করিলেন। আর এই কার্যের ফল ইন্দ্রের নিকট অতি সাংঘাতিক হইল। তিনি এই সোমরস পানের ফলে ছট্ফট্ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গ হইতে বীর্য (ইন্দ্রিয়) খসিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্র তাঁহার তেজ, বলবীর্য সব হারাইয়া ফেলিলেন।†

অসুর নমুচি ইন্দ্রকে জব্দ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তিনি এই সময় ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিলেন।‡ নমুচি ইন্দ্রের শারীরিক দৌর্বল্য দেখিয়া তাঁহাকে সুরার সাহায্যে বিশেষরূপে বলহীন করিয়া সোমের প্রভাব নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রের দুর্দশা দেখিয়া দেবতারা হায় হায় করিতে লাগিলেন। দেবতারা বলিলেন, যিনি ইন্দ্রকে আরাম করিতে পারিবেন, তাঁহারা তাঁহাকে পশুবলি প্রদান করিবেন। শেষে তাঁহারা স্থির করিলেন, অশ্বিদ্বয়কে ছাগ এবং সরস্বতীকে মেষ বলি দেওয়া হইবে।§ এদিকে ইন্দ্র রোগমুক্তির জন্য ভিষকের সাহায্য গ্রহণ করা দরকার বোধ করিলেন। বৈদিক যুগে ভিষক্ ছিলেন অশ্বিদ্বয়। তাহার পরেও বরাবর তাঁহাদের ভিষক্ বলিয়া খ্যাতি আছে। শুক্ল-যজুর্বেদ সরস্বতীকেও ভিষক্ বলিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, ভিষক্ যে অশ্বিদ্বয়, যজুর্বেদ সরস্বতীকে

---

* ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (১ম খণ্ড, ৩৫ অধ্যায়) ব্যাপারটি অন্য রকমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্দ্র ত্বষ্টাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যাকারী হন। ত্বষ্টা তখন বৃত্র নামক ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করেন। ইন্দ্র তাহাকেও হত্যা করেন। ইন্দ্র যতিবেশী রাক্ষসদের মারিয়া বুনো কুকুরদের দিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশধারী অরুর্মঘদের বধ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতিকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। এই পাঁচ অপরাধে দেবতারা ইন্দ্রকে বর্জন করিলে ইন্দ্র সোমপানে বঞ্চিত হন। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ উপনিষদ্ ও তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে, এই উপাখ্যানগুলি আছে।

† শতপথ-ব্রাহ্মণ, ১২. ৭. ১. ১-২

‡ ঐ, ১২. ৭. ১. ১০

§ ঐ, ১২. ৭. ১. ১০-১২

তাঁহাদের পত্নীও বলিয়াছেন। নদীরূপা সরস্বতীর সুস্থতাসম্পাদনকারিণী শক্তির পরিচয়ও আছে। অশ্বিদ্বয় যখন নমুচির নিকট হইতে সোম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবী সরস্বতী তাহা সংস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্র অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীর নিকট গমন করিলেন। শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করুন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন,—আমি নমুচির নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, দিবসে কিংবা রাত্রিকালে আমি নমুচিকে নিহত করিব না। দণ্ডাঘাতে, ধনু দ্বারা, মুষ্টি কিংবা হস্ত দ্বারা তাহাকে মারিব না। শুষ্ক কিংবা আর্দ্র দ্রব্য দ্বারা তাহাকে মারিব না। তবুও সে আমাকে বলহীন নিস্তেজ করিল। আমি যাহাতে আমার বল ফিরিয়া পাইতে পারি, আপনারা তাহার উপায় করিয়া দিন। সরস্বতী ইন্দ্রকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সৌত্রামণী যাগের সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্র নীরোগ হইয়া তেজোলাভ করিলেন। সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় জলাভিসেচনপূর্বক ইন্দ্রের জন্য বজ্র তৈরি করিয়া দিলেন। তখন ইন্দ্র নমুচিকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলেন। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে অথচ সূর্যও উদিত হয় নাই, এমন সময় ইন্দ্র না-শুষ্ক না-আদ্র অভিষিক্ত ফেনের দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদ করিলেন।*

সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে সৌত্রামণী যাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মেষ বলিস্বরূপ পাইয়াছিলেন। তাই সৌত্রামণী যাগে ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়ের বলির সহিত সরস্বতীর উদ্দেশে মেষ বলিও দেওয়া হইত।

শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন উপদেশ করেন যে, সোমযাগে বিভিন্ন দেবতার নিকট জীববলি দিতে হয়। কেশ-বপনীয়ের একমাস পরে অথবা তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ (১ ৮. ১৯) মতে পক্ষান্তে অমাবস্যার দিন ও শুক্লা প্রতিপদে "ব্যুণ্টিদ্বিরাত্র" করিতে হয়। ব্যুষ্টিদ্বিরাত্র করিতে হইলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র সোমযাগ করিতে হয়। অতিরাত্রের সঙ্গে ষোড়শী যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। ষোড়শীতে ইন্দ্রের দাবী। তাঁহার নিকট তিনটি বলি দিতে হয়। কাত্যায়নসূত্রের (৯. ৮. ৫) নির্দেশ এই যে, অতিরাত্রে সরস্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয়। তারপর একমাস পরে অথবা শ্রাবণী পূর্ণিমায় 'ক্ষত্রধৃতি' নামক অগ্নিষ্টোম করিতে হয়। তারপর কৃষ্ণপক্ষে সৌত্রামণী যাগ। সৌত্রামণী যাগে অনেক বিশেষ করণীয় আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ (৫. ৫. ৪. ১) বলিতেছেন,—

"শ্বেত আশ্বিনো ভবতি। শ্বেতাবিব হ্যশ্বিনাববিপ্রর্লহা সারস্বতী ভবত্যুষভমিন্দ্রায় সূত্রাণম্নাহআলভতে দুর্বেদা এবং সমৃদ্ধাঃ পশবো যদ্যেবং সমৃদ্ধান্ন বিন্দেদপ্যজানি-বালভেরংস্তে হি সুশ্রপতরা ভবন্তি স যদ্যজানা লভেরং লোহিত আশ্বিনো ভবতি তদ্যদেতয়া যজতে।"

অশ্বিদ্বয় লোহিতাভ শ্বেত বলিয়া তাঁহাদের নিকট লোহিতাভ শ্বেত ছাগ বলি দিতে হয়। সরস্বতীর নিকট মেষ (এড়ক) বলি দিতে হয়।

---

* শতপথ-ব্রাহ্মণ ১২. ৭. ৩. ১—৪

চিত্র—১৭

ক খ

ত্রিভঙ্গমুদ্রায় সরস্বতী — দ্বিভঙ্গমুদ্রায় সরস্বতী

(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থশালায় রক্ষিত)

সম্পূর্ণ সোমযাগের সাতটি অঙ্গ। সপ্তম ও শেষ অঙ্গ হইল বাজপেয়। অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম ছাড়া বাজপেয় একটি স্বতন্ত্র যাগ। বাজপেয়েও ষোড়শী যাগ করিয়া তিনটি বলি দিতে হয়। তারপর সরস্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে মধ্যম দিনে নানা দেবতার উদ্দেশে অন্যূন ৩৪৯ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু যূপে ও যূপান্তরালে বাঁধিয়া রাখা হইত। যাহাদের যূপে বাঁধা হইত, তাহাদের মধ্যে সকল রকম পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গই থাকিত। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দেবতার ন্যায় বাক্ ও সরস্বতীর জন্য পৃথক্ বলির ব্যবস্থা ছিল। সরস্বতীর জন্য মেষী, বৎসতরী প্রভৃতি গ্রাম্য পশু এবং পুরুষবাক্ অর্থাৎ মানুষের মত কথা কহিতে পারে, এমন শারিকা প্রভৃতি আরণ্য পশু থাকিত। গ্রাম্য পশুগুলিকে সত্য সত্যই বলি দেওয়া হইত, আর আরণ্য পশুগুলিকে মন্ত্রবলি দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় সরস্বতীর বলির একটা ব্যবস্থা আছে। বাক্‌শক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি ভালো-রকম কথা বলিতে না পারে, তাহাকে সরস্বতীর জন্য একটি মেষী হনন করিতে হইবে ; কারণ, সরস্বতীই বাক্। সরস্বতীর নিকট মেষী বলি দিলে সে ব্যক্তি দেবীর প্রসাদে বাগ্‌বিভব লাভ করিবেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞে একটি মেষী সরস্বতীর বলি। ইহাকে ঘোড়ার হনুর নীচে বাঁধিবার নিয়ম।*

সরস্বতীর বলি সম্বন্ধে শতপথ-ব্রাহ্মণে আর একটি আখ্যান আছে। প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্লান্তি-নিবারণের জন্য তিনি প্রযত্ন করিলেন। প্রজাগণ তাঁহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে নিকটে আনিতে প্রযত্ন করিলেন। তিনি এগারটি বলির পশুর প্রতি ঈক্ষণ করিলেন। তাহাতে নিজের মধ্যে বলাধান হইল। প্রজাগণ তাঁহার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিল। বলি প্রদান করিয়া তিনি অধিকতর সুস্থতা লাভ করিলেন। এইজন্য যজমান প্রজা ও ধনলাভ করিবার জন্য একাদশটি বলি দিয়া থাকে। প্রথম অগ্নির বলি, দ্বিতীয় সরস্বতীর বলি, তৃতীয় পূষার বলি। এইরূপে সোম, বৃহস্পতি, বিশ্বদেব, ইন্দ্র, মরুৎ, ইন্দ্রাগ্নি, সবিতা ও বরুণের বলি দিতে হয়। † সরস্বতীর বলি দিতে হয়, কেন না, শতপথ বলেন, সরস্বতীই বাক্। এই বাক্যের দ্বারা প্রজাপতি পুনরায় বলসঞ্চয় করিলেন। বাক্ তাঁহার দিকে ফিরিলেন, বাক্ আপনাকে তাঁহার বশবর্তিনী করিলেন। বাকের দ্বারা তিনি শক্তিমান্ হইলেন। ‡

শতপথ-ব্রাহ্মণ সরস্বতীকে যেমন চূর্ণ ইন্দ্রশালি, বদর (কুল) ও ঘৃত দিবার বিধি দিয়াছেন, তেমনই আবার চরু দিবারও ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইন্দ্র দেবতাদিগকে লইয়া বজ্রের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। বাক্ দেবগণকে "(বৃত্রকে) প্রহার কর, বধ

---

* শতপথ-ব্রাহ্মণ, ১৩. ২ ২৪
† ঐ, ৩. ৯. ১
‡ ঐ, ৩. ৯. ১. ৭
পরবর্তী যুগে পরাশর গৃহ্যসূত্রে সরস্বতীকে মধুমিশ্রিত যব দিবার বিধি দিয়াছেন।

করু" এই কথা বলিয়া অনুমোদন ও উৎসাহদান করিয়াছিলেন। আর বাক্ই সরস্বতী ; সুতরাং সরস্বতীর জন্য চরুর ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই জন্য সাকমেধ-যজ্ঞে মহাহবির মধ্যে সরস্বতীকে চরু দিতে হয়।*

যে সমস্ত দেবতার কাছে সংশুপ্ হবি দেওয়া হয়, কৃষ্ণযজুর্বেদে তাহাদের একটি তালিকা আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতা (১. ৮. ১৭) ও তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণেও (১. ৮. ১) এই রকম তালিকা আছে। তালিকায় দেবতার নাম, যথা— অগ্নি, সরস্বতী, সবিতা, পূষা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু।

সরস্বতীর নিকট পশুবলির কথা আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রেও (৩. ৯. ২) আছে।—

"আশ্বিন সারস্বতৈন্দ্রাঃ পশবঃ। বার্হস্পত্যো বা চতুর্থঃ।"২

এখন আমরা বৈদিক সাহিত্য হইতে দুইটি জিনিস পাইলাম। সরস্বতীর নিবট পশুবলি এবং তাঁহার জন্য চরু-দানের ব্যবস্থা। দুইটিই যে প্রথারূপে পরযুগেও প্রচলিত ছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন আছে। পতঞ্জলি ১৫০ পূর্বখৃস্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রণীত মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিকে উপদেশ করিয়াছেন,—

"সারস্বতীম্। 'যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি।—

আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেদিতি।' প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।"

আহিতাগ্নি অর্থাৎ সাগ্নিক ব্যক্তি অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য সারস্বতী ইষ্টি করিবে। প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য না হই, এই জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত।

দেখা যাইতেছে, লোকে যজ্ঞ করিবার সময় মধ্যে মধ্যে অপশব্দ প্রয়োগ করিলে প্রয়োগকর্তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সেই প্রায়শ্চিত্তের নাম সরস্বতী-যাগ বা সারস্বতী ইষ্টি। মনুসংহিতায়ও এই সারস্বত-যাগের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও এই যাগের উদ্দেশ্য প্রায়শ্চিত্ত ; কিন্তু তাহা অপশব্দ প্রয়োগের জন্য নয়— সত্যের অপলাপের জন্য, সাক্ষ্য দিতে গিয়া সত্য কথার পরিবর্তে মিথ্যা কথা বলার জন্য। শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ প্রমাদের বশবর্তী হইয়া এমন একটি কুকর্ম করিয়া ফেলিল, যাহার ফলে তাহাকে বধদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। মনু বলেন (৮. ১০৪) যেখানে সত্যকথা বলিলে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইবে, সেখানে মিথ্যা কথা বলাই উচিত। এখানে মিথ্যা সত্য অপেক্ষা প্রশস্ত। যাজ্ঞবল্ক্যও (২. ৮৩) এই ভাবের কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু যিনি মিথ্যা কথা বলিবেন, তাঁহাকে এই জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন,—

"বাগ্দৈবত্যৈশ্চ চরুভির্যজেরংস্তে সরস্বতীম্।
অনৃতস্যৈনসস্তস্য কুর্বাণো নিষ্কৃতিং পরাম্॥" ৮. ১০৫

* শতপথ-ব্রাহ্মণ ২. ৫. ৪৫

চিত্র—১৮

ক

অভঙ্গমুদ্রায় সরস্বতী

খ

অভঙ্গমুদ্রায় সরস্বতী

(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রত্নশালায় রক্ষিত)

এইরূপ মিথ্যা কথার জন্য যাঁহারা সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চান, তাঁহাদিগকে চরু দিয়া সরস্বতীযাগ করিতে হইবে। সরস্বতীযাগে চরুই বিধি। চরু-বিধির উল্লেখ আমরা পূর্বে করিয়াছি। ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন। ভরতের উক্তি এইরূপ :—

"ব্রহ্মাণং মধুপর্কেণ পায়সেন সরস্বতীম্।
শিববিষ্ণুমহেন্দ্রাদ্যাঃ সম্পূজ্যা মোদকৈরথ ॥" ৩. ৩৭

সরস্বতীর নিকট বলির প্রথা এখনও লোপ পায় নাই। ভদ্রকালীর নিকট বলির ব্যবস্থা আছে। ভদ্রকালী সরস্বতী—নীলাভ। বাংলার বরিশাল অঞ্চলে আজও সরস্বতীর নিকট সাদা ছাগ বলি দেওয়া হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় ষোড়শোপচার আয়োজনে নীল সরস্বতীর পূজা হইয়া থাকে। প্রতিমা নীলবর্ণের হয়। নীল-সরস্বতীর নিকট শ্বেত ছাগ বলি দিবার ব্যবস্থা। মাদারীপুর সবডিভিজনের অন্তর্গত কার্তিকপুরেও সরস্বতীপূজার দিন সরস্বতীর নিকট ছাগাবলি দেওয়া হয়। মাদারীপুরের অন্যান্য জায়গায় এ প্রথা প্রায়ই নাই। পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমায় সরস্বতী-পূজায় সাদা ছাগল বলি দিবার ব্যবস্থা আছে। বরিশালে, মাদারীপুরে এবং পূর্ববঙ্গের আরও দুই এক জায়গায় ছাত্রেরা পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিতে সরস্বতীর নিকট পাঁঠাবলির মানস করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সরস্বতী-পূজার দিনে নিরামিষ ভোজনই বিধি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলায় বিশেষত বরিশাল, রহমৎপুর, গৈলা প্রভৃতি স্থানে পূজার পূর্বে কাহারও বাড়িতে ইলিশ মাছ আসে না ; ঐ দিন প্রথম ইলিশ মাছ আনিয়া খাইতে হয়। জলাবাড়িতে ঐ দিন ইলিশ মাছ খায় এবং পাঁঠা বলি দেয়। সিরাজগঞ্জ মহকুমায়, বিক্রমপুর, ময়মনসিংহে ঐ দিন গৃহস্থগণ প্রথম ইলিশমাছ খায়। চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায়ও ঐ দিন কেহ মাছ খায় না। কুমারখালি ও তাহার নিকটবর্তী স্থান পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সীমায় অবস্থিত। এই সমস্ত স্থান অধুনা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হইলেও পূর্ববঙ্গের প্রথানুসারে সরস্বতীপূজার দিন প্রথম ইলিশ মাছ খাওয়ার নিয়ম বজায় রাখিয়াছে।

মাদারীপুর সবডিভিজনে অধিকাংশ জায়গায়ই সরস্বতীপূজার দিন জোড়া ইলিশমাছ খাওয়ার নিয়ম আছে। যদি জোড়া ইলিশমাছ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটি মাছের সঙ্গে একটি লম্বা বেগুন একসঙ্গে করিয়া জোড়া করিয়া লওয়া হয়। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে বিজয়া দশমীর দিন কেহ কেহ জোড়া ইলিশ মাছ বাড়িতে আনিয়া থাকেন। ইঁহারা পরেও ইলিশমাছ খাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ঐ দিন জোড়া ইলিশ না আনেন, তাঁহারা সরস্বতীপূজা পর্যন্ত আর ইলিশ মাছ খাইতে পারেন না।

মূর্তিতত্ত্বে সরস্বতী

সরস্বতীর কয়েক রকমের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

১। কোথাও তিনি একক বসিয়া থাকেন [চিত্র—১ ও চিত্র ২ (ক)]।

২। কোথাও তিনি একক দাঁড়াইয়া থাকেন [চিত্র—২ (খ)]।

৩। কোথাও তিনি ব্রহ্মার পরিবার-দেবতারূপে দণ্ডায়মানা।

৪। কোন স্থানে তিনি বিষ্ণুর পরিবার-দেবতারূপে দণ্ডায়মানা [চিত্র—৩]।

পদ্মাসীনা সরস্বতী

শাস্ত্র বলিয়াছেন, সরস্বতী শ্বেতপদ্মাসনা। আমাদের দেশে লোকে বরাবরই পদ্মফুলকে সকলের চেয়ে সুন্দর ফুল বলিয়া পদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে পদ্ম সকলেরই প্রিয়। ভারতে সকল যুগেই পদ্ম অতুলনীয় ছিল। ইহার আদর সকল যুগেই সমান। সাহিত্যের সেবায়, শিল্পকলার অনুশীলনে পদ্মকে কোন দিন কেহ ভোলে নাই। প্রাচীনতম বেদে পদ্মের উল্লেখ প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত ও নীল পদ্মের কথা ঋগ্বেদে বহুবার আছে। পুণ্ডরীক শ্বেতপদ্ম, পুষ্কর নীলপদ্ম। পরে ব্রাহ্মণ্যযুগে পদ্মের আদর আরও বাড়িয়া পড়ে। পরবর্তী যুগে সংস্কৃতসাহিত্যের কবিগণ পদ্মকে অপার মাধুর্যময় ও সৌন্দর্যের সার বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের কোন যুগের কলাশিল্পে পদ্মকে বাদ দিয়া তাহার চাতুরীর পরিচয় দেয় নাই। সকল ধর্মই পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু সকল ধর্মের প্রাচীনতম স্থাপত্য-নিদর্শনে ভারতের সর্বত্র পদ্ম বিরাজমান। যখন বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন যবদ্বীপ, সুমাত্রা, শ্যাম, জাপান প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্য প্রদেশেও মূর্তিশিল্প ও স্থাপত্যকলায় পদ্ম প্রকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে পদ্মকে আমরা সর্বপ্রথমে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ (১. ১. ৩. ৫ ইত্যাদি) বলেন, প্রথমে সমস্তই জলময় ছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। অমনই দেখিলেন—সরলভাবে একটি "পুষ্কর-পর্ণ" জলের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আবার তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে (১. ২৩. ১) দেখিতে পাই—যখন সমস্তই জলময় ছিল, তখন মাত্র প্রজাপতি পুষ্কর-পর্ণে উৎপন্ন হইলেন। পরে মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ধ্যানরত বিষ্ণুর নাভি হইতে উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি-পদ্ম হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল "অব্জ-জ," "অব্জ-যোনি" প্রভৃতি। বিষ্ণুর সঙ্গেও পদ্মের সম্বন্ধ আছে। বিষ্ণুর একটি নাম "পদ্ম-নাভ"। বিষ্ণু তাঁহার চারি হস্তের একটিতে পদ্মও ধারণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপত্নী শ্রীর নামও পদ্মা।

আমাদের পৌরাণিক আখ্যায়িকায় পদ্ম আসন ও পাদপীঠরূপেও প্রাচীনতম কাল

চিত্র—১৯

পদ্মহস্তে বসুমতী
(রংপুর-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত)

হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পদ্মের উপর দেব বা দেবী বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া থাকেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর-নাভি-পদ্মে আসীন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং তাঁহাদের শক্তিত্রয় সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্বতীর আসন—পদ্ম। অগ্নি, গণেশ, পবন—ইঁহারাও পদ্মের উপর বসিয়া থাকেন। সূর্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এবং তাঁহার অবতারগণের পাদপীঠ—পদ্ম। †

সরস্বতী সাধারণত পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা বা আসীনা থাকেন (চিত্র—৪, ৫, ৬, ৭)। শিল্পশাস্ত্রও এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন। ময়মুনি (ময়মত, ১২শ অধ্যায়) বলেন,—

"পদ্মং লক্ষ্যা সরস্বত্যা ও*-কারঞ্চ ত্রিবর্ণকম্"—৬৬ শ্লোক

শ্বেত পদ্মাসনে সরস্বতীর বসিয়া থাকিবার নিয়ম। অংশুভেদাগম (৫১ পটল) ও পূর্বকারণাগমও (১২ পটল) তাহাই বলিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে গঙ্গৈকোণ্ডচোড়পুরম্ (চিত্র—৮), বাগড়ি (চিত্র—৬) ও গদগে (চিত্র—৭) দ্বিহস্তা এইরূপ পদ্মোপবিষ্টা সরস্বতীর প্রস্তরমূর্তি আছে। *

স্থাপত্য-শিল্পে পদ্মাসনের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—উদয়গিরি, ভারহুত ও সাঁচীতে। সাঁচীর মহাস্তূপের দ্বারের উপরেই এই সমস্ত পদ্মাসন খুব বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই সমস্ত পদ্মাসনে লক্ষ্মী সমাসীনা।

সিংহলে শিব, পার্বতী ও কুবেরের পীঠাসন—পদ্ম। তিব্বতে সরস্বতীর পীঠাসনও—পদ্ম।

অংশুভেদাগম তাঁহাকে "শ্বেতপদ্মাসনান্বিতা" এবং পূর্বকারণাগম তাঁহাকে "শ্বেতপদ্মাসীনা" বলিয়াছেন।

হংসবাহনা সরস্বতী

বিষ্ণুধর্মোত্তর কিন্তু বলেন, সরস্বতী শ্বেতপদ্মের উপর দণ্ডায়মানা থাকিবেন। পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মার শক্তি। তখন তিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সংস্কৃত ভাষার জননী। ইঁহার বাহন প্রায়ই হংস। ব্রহ্মা হংসবাহন; সুতরাং হংসকেও প্রায়ই সরস্বতীর বাহনরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত দেখা যায়, দেবের যে বাহন, দেবপত্নীরও সেই বাহন। সেই হিসাবে ব্রহ্মাণী সরস্বতীরও প্রিয় বাহন হংস। মানস-সরোবর ব্রহ্মার প্রিয় স্থান। মানস-সরোবরের হংসও চিরপ্রসিদ্ধ। কালিদাসের মেঘদূত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কবিদের রচনায় মানস-সরোবরে হংস স্থান পাইয়াছে। হয়তো সেই জন্য হংস ব্রহ্মার বাহন হইয়া থাকিবে। আবার পুরাণাদিতে

---

† A. A Macdonell-এর প্রবন্ধ।

* Gopinath Rao : Elements of Hindu Iconography, pls. Cxiii, Cxiv, Cxv.

নির্দেশ আছে, সরস্বতী মানস-সরোবর হইতে উৎপন্না। কাজেই হংসের সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক ঘটা বিচিত্র নয়। কল্হণ রাজতরঙ্গিণীর প্রারম্ভে কাশ্মীরের বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সরস্বতী হংসরূপে ভেড়াগিরিশৃঙ্গে সরোবরে দর্শনদান করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভারতে গদগে হংসবাহনা দ্বিভুজা সরস্বতী আছে (চিত্র—৭)। পাদপীঠের দুইদিকে ২টি করিয়া পরিবার-দেবতা, মধ্যে হংস। পাদপীঠের উপরে পদ্মপীঠে সমাসীনা দেবী সরস্বতী।

মহীশূরে নেলমঙ্গল তালুকে একটি সরস্বতী-মন্দির আছে ; ইহার নাম সারদা-মন্দির। এই মন্দিরের প্রস্তরনির্মিতা চতুর্ভুজা সারদার বাহন হংস (চিত্র—৯)। সরস্বতী পদ্মাসনের উপর উপবিষ্টা। প্রস্তর-মূর্তিটি আধুনিক। লন্ডনের প্রত্নশালা—ব্রিটিশ মিউজিয়মে হংসবাহনা চতুর্ভুজা একটি সরস্বতী মূর্তি আছে। দেবীর দুই হস্তে বীণা, এক হস্তে অক্ষমালা, অপর হস্তে পুঁথি, পুঁথি বাঁধার ফিতাটি বেশ স্পষ্ট।

ময়ূর-বাহনা সরস্বতী

দক্ষিণ ভারতে বোম্বাই প্রদেশে সরস্বতী সাধারণত ময়ূর বাহনা (চিত্র—১১)। মূরের (Moore) গ্রন্থে (Moore's Hindu Pantheon) চতুর্হস্তা ময়ূরবাহনা সরস্বতীর ছবি আছে। রাজপুতানায়ও ময়ূরবাহনা সরস্বতী আছে। সম্প্রতি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম. এ, বি. এল মহাশয় একটি ময়ূরবাহনা অপূর্ব মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই মূর্তিটি দুই হাত বিস্তার করিয়া দুইটি ব্যাঘ্রের মস্তকে রাখিয়াছেন (চিত্র—১২)।

ক্যানিংহম্ সাহেব* বলেন প্রায় সমস্ত প্রাচীনতম হিন্দু মন্দিরেই গঙ্গা ও যমুনার ক্ষোদিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির-প্রবেশ-পথের দুই ধারে দুইটি মূর্তি থাকে। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর পৃথক্ পৃথক্ বাহন থাকে ; গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার কচ্ছপ, সরস্বতীর ময়ূর। ক্যানিংহমের মতে, গঙ্গায় মকরের প্রাচুর্য, যমুনায় কচ্ছপের এবং সরস্বতীর তীরে ময়ূরের আধিক্যবশত এইরূপ বাহন হইয়া থাকিবে।

মেষবাহনা সরস্বতী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের $\left(\frac{K(d)\,4}{377}\right)$ চিত্রশালায় একটি আসীনা সরস্বতী আছেন (চিত্র—১৩)। ইনি মহাম্বুজ-পীঠে 'সুখাসন'-মুদ্রায় বসিয়া আছেন। পাদপীঠে একটি মেষ আছে। দেবী মেষের পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণপদ রাখিয়াছেন। দেবীর চার হস্ত। উপরের দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা ; উপরের বাম হস্তে—পুস্তক ; নীচের দুইটি হাতে দেবী বীণা ধারণ করিয়া আছেন।

* (Archaeological Survey Report, Vol. IX. p 70)

চিত্র—২০

ক

নৃত্ত সরস্বতী

খ

নৃত্ত সরস্বতী—হলেবিড়ু

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায়ও মেষবাহনা একটি সরস্বতী-মূর্তি আছে (চিত্র—১৪)।

সিংহবাহনা সরস্বতী

সিংহবাহনা সরস্বতী বৌদ্ধ সরস্বতী। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর শক্তি সরস্বতী। মঞ্জুশ্রীর বাহন সিংহ ; সুতরাং তাঁহার শক্তি সরস্বতীর বাহনও সিংহ হইয়াছে।

গান্ধারে একটি ভগ্ন সরস্বতী-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে (চিত্র—১৫খ)। মূর্তিটির মুখটি একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মূর্তিটি সিংহের উপর সমাসীনা। সিংহের উপরে বসিয়া দুইটি পা একদিকে ঝুলাইয়া আছেন। আমাদের বীণার ন্যায় একটি বাদ্যযন্ত্র দেবী জানুর উপর রাখিয়া ধরিয়া আছেন। লাহোর চিত্রশালায়ও সিংহারূঢ়া এইরূপ একটি ভগ্নমূর্তি আছে।

বোধগয়া হইতে সোজা উত্তর-পূর্বে গেলে ১৫ মাইল দূরে সোভনাথ পাহাড় পড়ে। পাহাড়টি প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চ। ১৮৯৯।১৯০০ সালে ঐ পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানের একটি ছোট ছেলে পাহাড়ের উপর একটি স্তূপের ধার হইতে একটি সরস্বতীর মূর্তি পায়। মূর্তিটি অতি সুন্দর (চিত্র—১৫ ক)। দেবী চতুর্ভুজা। তাঁহার দুই হস্তে বীণা, অপর দুই হস্তে অক্ষমালা ও পুস্তক। সরস্বতী দ্বিদল পাদপীঠের উপর উপবিষ্টা। পাদপীঠের নিম্নে মধ্যভাগে একটি সিংহ। সিংহের উপর সুকৌশলে একটি পদ্ম বিন্যস্ত হইয়াছে। সেই পদ্মের উপর দেবীর দক্ষিণপদ স্থাপিত। সিংহের বামদিকে একজন উপাসক যুক্তকরে বসিয়া আছে। দক্ষিণ দিকে দুই পংক্তি ক্ষোদিত লিপি। সমস্তটা পড়িতে পারা গেল না। লিপিটির পাঠ এইরূপ—

× × × ধর্মোয়ং × × ×।

সিংহারূঢ়া বাগীশ্বরী

কলিকাতার প্রত্নশালায়ও (৩৯৪৭ সংখ্যক মূর্তি) একটি সিংহবাহনা চতুর্ভুজা বাগীশ্বরী মূর্তি আছে (চিত্র—১৬)। দেবীর দুই হস্তে পরশু ও গদা। অপর দুই হস্তে তিনি দানবের জিহ্বা উৎপাটন করিতেছেন। এই বাগীশ্বরী মূর্তিটি মগধে আবিষ্কৃত এবং দ্বিতীয় গোপালদেবের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত।

বারাণসী ঔসানগঞ্জ মহল্লায় যাগেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। ইহারই কিছু দূরে ঔসানগঞ্জ মহল্লার পাশে 'নাগকুয়া মহল্লা'। এখানকার প্রাচীন তীর্থ 'নাগকূপ' ; ইহারই কিছু দূরে বাগীশ্বরী-দেবীর মন্দির। বাগীশ্বরী-দেবীর মূর্তি অষ্টধাতুময়ী। দেবীর মস্তকে মুকুট,—বেশ বড়। দেবী সিংহোপরি আসীনা। মন্দিরের বারান্দায় নানা দেবদেবীর মূর্তি চিত্রিত। মন্দিরের এক কোণে একটি পাথরের সিংহ-মূর্তি। এটি আমেঠিরাজ দিয়াছেন।

সরস্বতীর প্রহরণ

সরস্বতীর হস্ত সংখ্যায় দুই বা চার। সাধারণত দুই হাত থাকিলে দেখা যায়, এক হাতে পুস্তক, অপর হাতে মালা। ব্রহ্মবৈবর্ত (ব্রহ্মখণ্ড, ৩ অধ্যায়) বলেন, "বীণাপুস্তকধারিণী।" সরস্বতীর চার হাত হইলে অপর দুই হাতে পাশ ও অঙ্কুশ, অথবা বীণা ও কমণ্ডলু থাকিবে।

মহীশূরের অন্তর্গত বেলুড় ও হলেবিড্ গ্রামের হৈসল রাজাদের মন্দিরগাত্রে সরস্বতীর কয়েকটি মূর্তি আছে। ঐ মূর্তিগুলির হস্তে অঙ্কুশ, বীণা, অক্ষমালা ও পুস্তক আছে। এই সমস্ত স্থাপত্যে সরস্বতী শিবশক্তি।

মহীশূরে মণ্ড্যাতালুকের অন্তর্গত বসরল গ্রামে মল্লিকার্জুন মন্দির আছে। ১২৩৫ খ্রীস্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মিত। এই মন্দিরের নবরঙ্গে উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি সুন্দর সরস্বতী মূর্তি আছে। দক্ষিণের মূর্তিটির চিত্র প্রদর্শিত হইল (চিত্র—২ক)। এই মূর্তির হস্তে অঙ্কুশ, বীণা, অক্ষমালা ও পুস্তক।

ইহার ব্যতিক্রমও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অংশুভেদাগম (৪৯ পটল) দক্ষিণ-ভারতের আগম। ইহাতে সরস্বতী-মূর্তির বর্ণনা এইরূপ ঃ

"ব্যাখ্যানং চাক্ষসূত্রঞ্চ দক্ষিণে তু করদ্বয়ে।
পুস্তকং পুণ্ডরীকঞ্চ ত্রিনেত্রা চারুরূপিণী ॥"

দেবীর দক্ষিণ দিকের একহাতে অক্ষমালা, অপর হস্তে ব্যাখ্যানমুদ্রা। বাম হাত দুটিতে পুস্তক ও শ্বেতপদ্ম। বিষ্ণুধর্মোত্তরে দেখা যায়, বামদিকের একটি হাতে পদ্মের পরিবর্তে কমণ্ডলু। দেবী দক্ষিণ হস্তে ব্যাখ্যান-মুদ্রার সহিত বীণা ধারণ করিয়া আছেন।

সরস্বতীর কর্ণে কুণ্ডল থাকে। পূর্বকারণাগম বলেন, তাঁহার কর্ণকুণ্ডল মুক্তার— "মুক্তাকুণ্ডলমণ্ডিতাম্"; কিন্তু অংশুভেদাগম-মতে সরস্বতীর কুণ্ডল রত্নখচিত— "রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতা।"

স্কন্দ-পুরাণের সূতসংহিতায় সরস্বতীর মস্তকে জটামুকুট। এই মুকুটে চন্দ্রকলা সন্নিবিষ্ট। সরস্বতী নীলকণ্ঠা, ত্রিনেত্রা।

"জটাজুটধরা শুভ্রা চন্দ্রার্ধকৃতশেখরা।
পুণ্ডরীকসমাসীনা নীলগ্রীবা ত্রিলোচনা ॥"

সরস্বতী শ্বেতপদ্মাসীনা, শ্বেতবর্ণা, শ্বেতবস্ত্রাবৃতা। দেবীর মস্তকে জটামুকুট। দেবী যজ্ঞোপবীত-ধারিণী, হারমুক্তাভরণভূষিতা। সমস্ত মূর্তিতেই দেবী ত্রিনেত্রা। তাঁহার মস্তকের চারিদিকে প্রভামণ্ডল।

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে (বিষ্ণুধর্ম) আছে—

"পুস্তকং চাক্ষমালা চ তস্যা দক্ষিণহস্তয়োঃ।
বাময়োশ্চ তথা কার্যা বৈষ্ণবী চ কমণ্ডলুঃ।"

চিত্র—২২

সরস্বতী মুদ্রা

পূর্বকারণাগম (১২ পটল)—

"সুদণ্ডং দক্ষিণে হস্তে বামহস্তে চ পুস্তকম্ ।
দক্ষিণে চাক্ষমালা চ করকং বামকে করে ॥"

রূপমণ্ডনমতে—

"অক্ষাব্জবীণাপুস্তকং মহাবিদ্যা প্রকীর্তিতা ।
বরাক্ষাব্জং পুস্তকঞ্চ সরস্বতী শুভাবহা ॥"

সরস্বতীর এক ধ্যানে আছে—

"মুক্তাহারাবদাতাং শিরসি শশিকলালঙ্কৃতাং বাহুভিঃ স্বৈ-
র্ব্যাখ্যাং বর্ণাক্ষমালাং মণিময়কলসং পুস্তকঞ্চোদ্বহন্তীম্ ।"

ললিতাসনে আসীনা সরস্বতী

১৯০৪-৫ খ্রীস্টাব্দে বীণাবাদনরতা দেবী সরস্বতীর একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে তাহা সারনাথ চিত্রশালায় [B (f) 27] রক্ষিত। এই মূর্তি এক উচ্চ আসনে ললিতাসনমুদ্রায় আসীনা। দেবী নানালঙ্কার-ভূষিতা। ইহা মধ্যযুগের ভাস্কর্যের নিদর্শন। মূর্তিটি লাল বেলে পাথরে ক্ষোদিত।

সরস্বতী মূর্তির ভঙ্গী

বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে অনেক সময় সরস্বতীকে দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় এইরূপ অনেকগুলি মূর্তি আছে। সরস্বতীমূর্তির ভংগী সাধারণত সমভংগ। পরিষদের চিত্রশালায় $\frac{\text{F. (a) 2}}{12}$ 'সমপদস্থানক' মুদ্রায় পদ্মপীঠে দণ্ডায়মানা একটি বিষ্ণুমূর্তি আছে। ঐ মূর্তির দক্ষিণপার্শ্বে লক্ষ্মী, বামপার্শ্বে বীণাহস্তে সরস্বতী; (চিত্র—১৭ক) উভয় স্ত্রীমূর্তিই ত্রিভঙ্গ। এখানে আর চারিটি বিষ্ণু-(ত্রিবিক্রম) মূর্তি আছে। ইহাদেরও বামপার্শ্বে বীণাহস্তা সরস্বতী। ত্রিভংগ-মুদ্রায় এক পা বাড়াইয়া দেবী দণ্ডায়মানা। বিষ্ণুমূর্তির সহিত যে সরস্বতী থাকেন, তিনি প্রায়শ পদ্মপীঠে দণ্ডায়মানা। সাহিত্য-পরিষদের এইরূপ একটি মূর্তিতে ত্রিবিক্রম যে ভদ্রপীঠে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাতে এই মূর্তিও দণ্ডায়মানা। পরিষদে বিষ্ণুর একটি তাম্রমূর্তি আছে। ত্রিভঙ্গ-মুদ্রায় এখানেও সরস্বতী বীণাহস্তে দণ্ডায়মানা। এখানে সরস্বতী পঞ্চরথ ভদ্রপীঠের উপর পদ্মপীঠে দণ্ডায়মানা। আরও একটি তামার কেশব-মূর্তিতেও সরস্বতী আছেন। পরিষদে (চিত্র—১৭খ) $\frac{\text{K. (d) 2}}{19}$ দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় একটি বীণাহস্তা সরস্বতী আছেন। পরিষদের $\frac{\text{F. (a)}}{353}$ 15 সংখ্যক বিষ্ণু-মূর্তিতে দেবী অভংগমুদ্রায় দণ্ডায়মানা (চিত্র—১৮ক)। বিষ্ণুমূর্তিতে অভংগমুদ্রায় আরও এক সরস্বতী আছেন $\frac{\text{K. (d)}}{282}$ 1, ইঁহার হস্তে বীণা।

এই সরস্বতী নানালংকার-বিভূষিতা (চিত্র—১৮খ)। ১৯১১-১২ সালের Archaeological Survey of India, Annual Report-এ রংগপুরে প্রাপ্ত পাঁচটি বিষ্ণুমূর্তির প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মূর্তিতে বিষ্ণুর দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে বীণাহস্তে সরস্বতী (pl LXX. No. 1 ; pl LXXI. Nos. 3.4.5.)। রংগপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৫ম খণ্ড, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ১২৮) ৭০ সংখ্যক প্লেটের দ্বিতীয় বিষ্ণুমূর্তিটির পরিচয়ে স্বর্গত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন বিষ্ণুর বামদিকের মূর্তিটি সরস্বতী ; ইঁহার বীণা বক্রভাবে ধৃত। স্পুনার (D.B Spooner) সাহেব দেখাইয়াছেন (A.S.R—পৃ. ১৫৫) যে, বক্রভাবে ধৃত পদার্থটি বীণা নয়—পদ্ম। অবশ্য এই পদ্ম অর্থে পদ্মনালই বুঝিতে হইবে। বীণা সোজাই হয়—এরূপ বক্র বীণা কোথাও দেখা যায় নাই। এ মূর্তিটি সরস্বতীর নয়—বসুমতীর, আর দক্ষিণে ইন্দিরা। শারদাতিলক ধ্যানে তাহাই বলিয়াছে—

"উদ্যদিন্দব্যবরাভয়োপেতকরং শংখং গদাং পংকজম্।
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরাবসুমতীসংশোভিপাশ্বর্দ্বয়ম্॥
কেয়ূরাংগদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভম্।
দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষবিলসচ্ছ্রীবৎসচিহ্নং ভজে॥"

নৃত্ত-সরস্বতী

তিরুমকূডলু-নরসিপুর তালুক মহীশূররাজ্যের অন্তর্গত মহীশূর জেলায়। এ তালুকের মধ্যে সোমনাথপুর। ইহা কাবেরী নদীতীর হইতে ১০ ক্রোশ। এই সোমনাথপুরে কেশবমন্দির। ইহাতে হৈসল-স্থাপত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। এই মন্দিরের বাহিরের প্রাচীরে ১৯৪টি মূর্তি আছে। তন্মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহিষমর্দিনী প্রভৃতি ১১৪টি স্ত্রীমূর্তি, অবশিষ্ট মূর্তি নরসিংহ, বরাহ, হয়গ্রীব, বেণুগোপাল, পরবাসুদেব, ব্রহ্মা, শিব গণপতি, ইন্দ্র, মন্মথ, সূর্য, গরুড় প্রভৃতির। এই মন্দিরের বাহিরের প্রাচীরে নৃত্তবিষ্ণু, নৃত্তগণপতি, নৃত্তলক্ষ্মী ও নৃত্তসরস্বতীর মূর্তিও আছে।

নৃত্তসরস্বতী দ্বিভুজা—নানারত্নালঙ্কারভূষিতা। দেবীর হস্তে সাধারণত বীণা থাকে। কোন কোন মূর্তিতে নৃত্তসরস্বতীর হস্তে বীণা নাই। নৃত্তসরস্বতীর এই মূর্তিটি অতি সুন্দর। ভংগীও মনোজ্ঞ। হলেবিডুতে একটি সুন্দর নৃত্যপরায়ণা সরস্বতীর মূর্তি আছে। (চিত্র—২০খ) সেটিও চমৎকার (Gopinath Rao, pl. CXVI)।

বীণাহস্তে লক্ষ্মী

শুক্রনীতিসারে (৪,৪,৩০০ শ্লোক) শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর সাত্ত্বিক মূর্তি বর্ণনায় শুক্রাচার্য বলিতেছেন, সাত্ত্বিক মূর্তিতে শ্রীর চারিটি হাত থাকিবে। এই চারি হস্তে থাকিবে—বীণা, লুংগ (ফল), অভয় ও বরদমুদ্রা।

চিত্র—২৩

মহাসরস্বতী—বৌদ্ধ

মুদ্রা

প্রায় পনর বৎসর পূর্বে এলাহাবাদের নিকট ভিটায় অনেকগুলি (seal) মোহবকরা মুদ্রা পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটি গোলাকৃতি সীলের একদিকে উপরিভাগে পাদপীঠে একটি কুম্ভ ; পাদপীঠের নীচে উত্তর-গুপ্তাক্ষরে ছাপ দিয়া আঁকা সরস্বতী ; সীলের অপর দিকে কিছু নাই। সীলটির ব্যাস আধ ইঞ্চি। (র‍্যাপসনের Coins of the Andhras and W. Kshatrapas [pl. V. 105] নামক গ্রন্থ ও Report of the Arch. Survey of India, 1911-12, p. 50. দ্রষ্টব্য। (চিত্র—২২)

ঢাকা চিত্রশালায় সমাচার-দেবের দুইটি মুদ্রা সংরক্ষিত আছে। তম্মধ্যে একটি মুদ্রার পশ্চাদ্‌ভাগে সরস্বতী-মূর্তি আছে। দেবী পদ্মের উপরে ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় দাঁড়াইয়া আছেন। দেবীর দৃষ্টি দক্ষিণ দিকে ; দেবীর বাম হস্ত একটি সনাল পদ্মের উপরে রক্ষিত। দেবী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অপর একটি পদ্ম মুখের দিকে টানিয়া আনিতেছেন। দক্ষিণ হস্তের কণুই-এর নীচে একটি পদ্মনালের উপরে পদ্মের কুঁড়ি। আর ইহার নিম্নে একটি উন্নীতগ্রীব হংস।

সরস্বতীর স্থান

"শ্রীধরাশ্বমুখৌ পার্শ্বদ্বয়ে বাগীশ্বরী ক্রিয়া।
কীর্তির্লক্ষ্মীস্তথা সৃষ্টির্বিদ্যা শান্তিশ্চ মাতরঃ॥"

বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়, ব্রহ্মার চক্ষু মুদিত, তিনি ধ্যানমুদ্রায় সাতটি হংসের রথে সমাসীন। দক্ষিণে সরস্বতী, বামে সাবিত্রী। ইঁহারা সুন্দরী, বিশেষভাবে অলঙ্কৃতা। কালিকাপুরাণে (৮২ অধ্যায়) চতুর্মুখ চতুর্ভুজ ব্রহ্মার এক বর্ণনা আছে। তিনি কখনও রক্তকমলে, বা হংসারূঢ়। এই ব্রহ্মার সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা কখনও সরস্বতী।

তন্ত্রসমুচ্চয়ে (২য় ভাগ, ৯ম পটল, ১৩৫:শ্লোক) পাওয়া যায় যে, উত্তরমাতৃগণের উভয় পার্শ্বে শ্রীধর ও অশ্বমুখের সংস্থিতি। তাঁহাদের মধ্যে থাকিবেন—

বাগীশ্বরী, ক্রিয়া, কীর্তি, লক্ষ্মী, সৃষ্টি, বিদ্যা ও শান্তি, এই সপ্তমাতৃগণ।

দক্ষিণ-ভারতের শিল্পশাস্ত্র 'রূপমণ্ডনে' লিখিত আছে যে, গণেশ-মন্দিরে গণেশের বামদিকে থাকিবেন গজকর্ণ, তাঁহার দক্ষিণে সিদ্ধি, উত্তরে গৌরীমূর্তি পূর্বে বালচন্দ্র, দক্ষিণে সরস্বতী, পশ্চিমে সরস্বতীর পশ্চাতে কুবের। নারদপঞ্চরাত্রাগমের তৃতীয় রাত্রির প্রথম অধ্যায়ে কতকগুলি দেবতা ও তাঁহাদের শক্তির নাম আছে, তম্মধ্যে দ্বাদশ সংখ্যায় পাওয়া যায়—সঙ্কর্ষণের শক্তি সরস্বতী।

শিল্পরত্নে (৫ম অধ্যায়) গ্রামাদি-লক্ষণ-সম্পর্কে পাওয়া যায় যে, গ্রামে শ্রীমন্দির

থাকিবে। আর শ্রীমন্দির-প্রাকারে কয়েকটি দেবতা থাকিবেন, তন্মধ্যে সরস্বতী একজন।

ইন্দ্রশ্চ বাসুদেবো গুহো জয়ন্তশ্চ বৈশ্রবণঃ। ১৪½
অশ্বিন্যৌ শ্রীমন্দিরশিবৌ চ দুর্গা সরস্বতী চেতি।
প্রাকারস্থাস্ত্বেবতে যস্মিংস্তদ্ দিব্যদুর্গং স্যাৎ। ১৫½

কেমন করিয়া ব্রহ্মার মন্দির তৈরি করিতে হয়, রূপমণ্ডনে তাহার একটি প্রকরণ আছে। ইহাতে দেখা যায়, সাবিত্রী, সরস্বতী প্রভৃতি ব্রহ্মার পার্শ্বদেবতা রূপে থাকিবেন।

কারণাগম সভাপতি সম্পর্কে লিখিয়াছেন—কৈলাসপর্বতশৃঙ্গে রত্নখচিত আসনে সমাসীনা দেবী গৌরীর সম্মুখে চন্দ্রমৌলী শিব সন্ধ্যায় নৃত্য করিতেছেন। সকল দেবতা সেই নৃত্যে যোগ দিয়াছেন—ব্রহ্মা করতাল, হরি (বিষ্ণু) পটহ, ভারতী (সরস্বতী) বীণা বাজাইতেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্র বংশীধ্বনি করিতেছেন। তুম্বুরু ও নারদ সঙ্গীত করিতেছেন এবং নন্দী ও কুমার বাদ্য বাজাইতেছেন। ময়মত আরও অন্য দেবতার নাম করিয়াছেন। শিবের নৃত্য ভুজঙ্গত্রাসিত। বর্গেসের "Elora Cave Temples," pl. 43, fig. 5-এ এই দৃশ্যের ছবি আছে।

এলিফান্টায় পর্বতক্ষোদিত গুহায় গঙ্গাধরমূর্তি আছে। এই সুন্দর খুপীর (panel) মধ্যস্থলে শিব ও উমার মূর্তি আছে। শিবের মস্তকের উপর যমুনা ও সরস্বতী-মিলিত গঙ্গার ত্রিমূর্তি আছে।

গৌরী-মন্দিরে কেন্দ্রস্থলে থাকিবেন গৌরী। গৌরীর বামে সিদ্ধি; দক্ষিণে শ্রী; আর পৃষ্ঠকর্ণভাগে থাকিবেন সরস্বতী; গণেশ উত্তর-পূর্ব এবং কুমার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে থাকিবেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বীজাপুর জেলায় অইহোলে একটি শিবমন্দির আছে। ইহাতে একটি ব্রহ্মার মূর্তি আছে। ব্রহ্মার দক্ষিণে সরস্বতী ও সাবিত্রী ব্রহ্মার মস্তকে পুষ্পমাল্য দিতেছেন।

হলেবিড়ুর হৈসল-মন্দিরে ব্রহ্মার একটি দণ্ডায়মানা মূর্তি আছে। তাঁহার দুইধারে দুইটি রমণী চামর ধরিয়া আছেন। সম্ভবত ইঁহারা সরস্বতী ও সাবিত্রী।

কলিকাতার যাদুঘরে (Gupta Gallery) একটি প্রস্তর-মূর্তি আছে। ইহাতে ব্রহ্মার বামজানুর উপর সরস্বতী আসীনা। তাঁহার একহস্ত ব্রহ্মার স্কন্ধবেষ্টিত।

মহীশূরে শৃঙ্গেরীমঠে সরস্বতী যে মূর্তিতে পূজিত, তাহা সারদা। তাঁহার পাঁচ মুখ, চার হাত। ইনি চতুঃষষ্টিকলার অধিষ্ঠাত্রী। দশহরার দিন ফল, ফুল, চন্দন, গন্ধ দিয়া ইঁহার পূজা হয়।

চিত্র—২৪

মহাসরস্বতী—বৌদ্ধ

চিত্র—২৫

বজ্রসরস্বতী

চিত্র—২৬

বজ্রবীণাসরস্বতী

বৌদ্ধশাস্ত্রে সরস্বতী

ব্রাহ্মণগ্রন্থে সরস্বতী পুরাপুরি বাগ্দেবী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তারপর পৌরাণিক যুগে বাগ্দেবী সরস্বতী রীতিমত পূজিত হইতে লাগিলেন। বৌদ্ধেরাও সরস্বতীকে আত্মসাৎ করিতে ছাড়েন নাই। বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগে দেবী সরস্বতী বৌদ্ধতন্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত হইয়া পড়িলেন। সরস্বতী হিন্দুদেরও যেমন প্রিয়, বৌদ্ধতান্ত্রিকদেরও তেমনই প্রিয় হইলেন। বৌদ্ধতন্ত্রে আবশ্যকমত তাঁহার রূপের একটু-আধটু পরিবর্তন ঘটিল। বৌদ্ধদের একবক্ত্রা দ্বিহস্তা সরস্বতী তো রহিলেনই আবার তিনি তিন মুখ ও ছয়হাতেও বিরাজিতা হইলেন (চিত্র—২৩, ২৪)। অবলোকিতেশ্বর শ্রেষ্ঠ বোধিসত্ত্ব। তাঁহার নীচেই মঞ্জুশ্রীর স্থান। মঞ্জুশ্রীর অপর নাম মঞ্জুনাথ, মঞ্জুঘোষ। ইনি বিদ্যার অধিপতি বলিয়া ইঁহার একটি নাম বাগীশ্বর। ত্রিপিটক বা ললিতবিস্তর, দিব্যাবদান প্রভৃতি গোড়ার দিকের সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে মঞ্জুশ্রীর উল্লেখ নাই। সুখাবতীব্যূহে তাঁহার নাম আছে। লংকাবতারসূত্রে তিনি প্রধান কর্তা। ২৭০ খ্রীস্টাব্দে চীনা ভাষায় রত্নকারণ্ডব্যূহের তর্জমা হয়। ইহাতে মঞ্জুশ্রীকে খুব বাড়ান হইয়াছে। সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে তিনি প্রধান বোধিসত্ত্ব, মৈত্রেয়ের শাস্তা। মঞ্জুশ্রী চিরযৌবন।

ভারতে তাঁহার পূজা হইত। নেপাল, তিব্বতে হইত—চীন, জাপান, জাভায় হইত। মঞ্জুশ্রী জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা স্মৃতি প্রভৃতির দেবতা।

তাঁহার কোন শক্তি নাই। কিন্তু একখানি মঞ্জুশ্রীচরিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ্মী বা সরস্বতী অথবা উভয়েই তাঁর শক্তি। এই বইখানির নাম মঞ্জুশ্রীবিক্রীড়িত (Nanjio. 184, 185); ৩১৩ খ্রীস্টাব্দে চীনা ভাষায় ইহার তর্জমা হয়।

সরস্বতী বাগীশ্বরী। মঞ্জুশ্রীরও নাম বাগীশ্বর। বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা বাগীশ্বর-শক্তি বাগীশ্বরীর ভক্ত হইয়া পড়িয়া বাগীশ্বরী নামেও সরস্বতীর পূজা করিতে লাগিলেন। হিন্দুতান্ত্রিকেরাও বাগীশ্বরীর পূজা প্রচলন করিলেন। পঞ্চরাত্রাগমে আছে, তাঁহার তিন চক্ষু, চার হাত। চার হাতে দণ্ড, পুস্তক, মালা, কমণ্ডলু। ক্রমশঃ বাগীশ্বরীর প্রকারভেদও হইল। ধেনু-বাগীশ্বরী—সৌভাগ্য-বাগীশ্বরী। ইঁহাদের তিন চক্ষু—মস্তকে জটামুকুট। ধেনুবাগীশ্বরী হিন্দু তান্ত্রিকমতে শব্দব্রহ্ম (Logos)। বৌদ্ধদের সাধনমালায় কয়েক প্রকারের সরস্বতীর ধ্যান আছে। এক-বক্ত্রা দ্বিহস্তা সরস্বতী চারি প্রকার—

১. মহাসরস্বতী, ২. বজ্রবীণাসরস্বতী, ৩. বজ্রসারদা, ৪. আর্যসরস্বতী।

১. মহাসরস্বতী

মহাসরস্বতী চন্দ্র-মণ্ডলে অবস্থিত। তিনি দ্বাদশবর্ষাকৃতি নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা। মুখ ঈষৎ হাস্যযুক্ত। মূর্তি দিয়া করুণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দেবীর বক্ষে

মুক্তাহার। দেবীর দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা, বামহস্তে তিনি সনাল শ্বেতপদ্ম ধরিয়া আছেন। তাঁহার সমস্তই সাদা। গায়ের রঙ শরতের চাঁদের কিরণের মত ধবধবে সাদা; যে পদ্মের উপর তিনি অবস্থিত, সেটিও সাদা। তাঁর বসন শুভ্র; তিনি ধারণ করেন যে পুষ্প ও চন্দন, তাহাও শ্বেতবর্ণ। মহাসরস্বতীর সম্মুখে চারটি নিজ নায়িকা থাকেন। সামনে থাকেন প্রজ্ঞা, পিছনে মতি, দক্ষিণে মেধা, বামে স্মৃতি। মহাসরস্বতীর ধ্যান এইরূপ (চিত্র—২৩, ২৮):

চন্দ্রমণ্ডল ও তন্মধ্যে শ্বেতপদ্ম; পদ্মের চারিদিকে হ্রীঃকার। প্রথমে এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। তাবপর সেই পদ্মে—

"তেন চ ভগবতীং মহাসরস্বতীমনুবিচিন্তয়েৎ শরদিন্দুকরাকারাং সিতকমলোপরি চন্দ্রমণ্ডলস্থাং দক্ষিণকরেণ বরদাং বামেন সনালসিতসরোজধরাং স্মেরমুখীমতিকরুণাময়াং শ্বেত-চন্দনকুসুমবসনধরাং মুক্তাহারোপশোভিতহৃদয়াং নানারত্নালঙ্কারবতীং দ্বাদশবর্ষাকৃতিং মুদিতকুচমুকুলদন্তুরোরস্তটীং স্ফুরদনন্তগভস্তিব্যূহাবভাসিতলোকত্রয়াম্। ততস্তৎপুরতো ভগবতীং প্রজ্ঞাং দক্ষিণতো মেধাং পশ্চিমতো মতিং বামতঃ স্মৃতিং এতাঃ স্বনায়িকা-সমানবর্ণাদিকাঃ সম্মুখমবস্থিতাশ্চিন্তনীয়াঃ।"—সাধনমালা, সংখ্যা ১৬২, পৃ. ৩২৯

দেবীমাহাত্ম্যে মহাসরস্বতী

হিন্দুতান্ত্রিকেরাও আদ্যাশক্তি দুর্গাকেও মহাসরস্বতী রূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মহাসরস্বতী অষ্টভুজা। দক্ষিণদিকের চারি হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, হল, শূল, ঘণ্টা এবং বামদিকের চারি হস্তে মুষল, চক্র, ধনুঃ ও সায়ক। পদ্মের উপর দেবী পদ্মাসনে আসীনা। (চিত্র—৫০)

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে দেবীর প্রথম চরিতের দেবতা মহাকালী, দ্বিতীয় চরিতের দেবতা মহালক্ষ্মী, উত্তরচরিতের রুদ্র ঋষি, মহাসরস্বতী দেবতা, উষ্ণিক্ ছন্দঃ, ভীমাভ্রামরী বীজ, বায়ু তত্ত্ব। ইহাতে মহাসরস্বতীর একটি ধ্যান আছে। ধ্যানটি এই:

"ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খমুষলে চক্রং ধনুঃসায়কং।
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্য প্রভাম্॥
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বাং মন্ত্রসরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দিনীম্॥"

এই মন্ত্রের দ্বারা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া মার্কণ্ডেয়-পুরাণোক্ত নিত্য চণ্ডীস্তব পাঠ করিবার নিয়ম আছে। এখানে দেখা যাইতেছে দুর্গাই মহাসরস্বতী। সরস্বতী যে চণ্ডী—দুর্গা, মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ২৩ অধ্যায়ে অর্জুনের দুর্গাস্তোত্র আছে। ঐ স্তোত্রে আমরা পাই—

চিত্র—২৭

বজ্রসারদা

"ত্বং মহাবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্।
স্কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তারবাসিনি ॥ ৮০৩
স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যতে ॥" ৮০৪

খুব প্রাচীন না হইলেও পূজাপদ্ধতিতে দেখা যায় ভদ্রকালী ও সরস্বতী অভিন্ন।
"ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।"

'সাধনসমুচ্চয়ে' আর্যবজ্রসরস্বতী, বজ্রবীণা-সরস্বতী, বজ্রসারদা ও কৃষ্ণযমারিতন্ত্রোক্ত বজ্র-সরস্বতীর কথা আছে।

২. বজ্রবীণা সরস্বতী

ইনিও দ্বিভুজা—শুভ্রবর্ণা। মহাসরস্বতীর সহিত অপর সকল বিষয়েই সাদৃশ্য আছে। বিশেষ এই যে, ইঁহার দুই হাতে বীণা। সাধনমালা ইঁহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"সপ্তমস্য দ্বিতীয়স্থমষ্টমস্য চতুর্থকম্।
প্রথমস্য চতুর্থেন ভূষিতং তৎ সবিন্দুকম্ ॥
তদুদ্ভবাং সরস্বতীং বীণাবাদনতৎপরাম্।
চন্দ্রাবদাতনির্ভাসাং সর্বালঙ্কারভূষিতাম্ ॥"

—সংখ্যা ১৬৫, পৃ. ৩৩৫

জপমন্ত্র…"ওঁ পিচু পিচু প্রজ্ঞাবর্ধনি জ্বল জ্বল মেধাবর্ধনি ধিরি ধিরি বুদ্ধিবর্ধনি স্বাহা।" (চিত্র—২৬)

৩. বজ্রসারদা

দেবীর দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, অপর হস্তে পুস্তক। ইনি সর্বালঙ্কারভূষিতা, ত্রিনেত্রা। ইঁহারও বর্ণ শ্বেত। দেবী পদ্মোপরি অবস্থিতা। মুকুটে অর্ধচন্দ্র। (চিত্র—২৭; ৩০ক, ৩১) ইঁহার ধ্যান এইরূপ ঃ

"শুভ্রাম্বুজোপরি লসত্তনুমাদধানাং
নেত্রত্রয়ং মুকুটসংস্থিতমর্ধচন্দ্রম্।
বামেন পুস্তকধরাম্বুজমন্যহস্তে
পশ্চাৎ স্বদেহসমতামনয়ং প্রযত্নং ॥"

—সাধনমালা, সংখ্যা ১৬৬, পৃ. ৩৩৭

৪. বজ্রসরস্বতী বা আর্যসরস্বতী

সাধনমালায় (পৃ. ৩৪০, সং ১৬৮) ইঁহার বর্ণনা এইরূপ—

"সিতবর্ণাং মনোরমাং দক্ষিণেন রক্তাম্বুজধারিণীং বামেন প্রজ্ঞাপারমিতা-পুস্তক-ধারিণীম্।"

এই মনোরমা মূর্তির দক্ষিণ হস্তে রক্তপদ্ম, বামহস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা-পুস্তক। ইনি শ্বেতবর্ণা শুভ্রাম্বরা এবং ষোড়শী যুবতীর আকৃতিসমন্বিতা। চন্দ্রবীজাদি-নিষ্পন্না এই দেবীর অপর নাম "আর্য-সরস্বতী।" (চিত্র—২৫, ২৯, ৩০খ) ইঁহার মন্ত্র, যথা—

"ওঁ পিচু পিচু প্রজ্ঞাবর্ধনি
জ্বল জ্বল মেধাবর্ধনি
ধিরি ধিরি বুদ্ধিবর্ধনি স্বাহা।"

আর্যবজ্রসরস্বতী

ইনি ত্রিবদনা রক্তদ্যুতিসমন্বিতা। সদ্ভূষণালঙ্কৃতা এই দেবী প্রত্যালীঢ়পদে অবস্থিতা। ইঁহার ছয় হাত। দক্ষিণ তিন হস্তে পদ্ম, অসি ও কর্ত্রী। বামদিকের তিন হস্তে ব্রহ্মকপাল, রত্ন ও চক্র। দেবীর দক্ষিণদিকের মুখটি নীলবর্ণ, বামভাগের মুখ শ্বেতবর্ণ। আর্যবজ্রসরস্বতী বা বজ্রসরস্বতীর ধ্যান এইরূপ (চিত্র—২৪):

"তস্মাদ্ রক্তমহাদ্যুতিং ভগবতীং সদ্ভূষণালঙ্কৃতাং
প্রত্যালীঢ়পদাস্থিতাং ত্রিবদনাং ষড়্‌বাহুভির্ভূষিতাম্ ॥
সব্যে নীলমুখাং বিভর্তি চ করে পদ্মাসিকর্ত্রীংশ্চ বৈ।
বামে শুক্লমুখাং চ পাত্রসহিতাং সদ্রত্নচক্রং তথা।"

কৃষ্ণযমারিতন্ত্রে বজ্রসরস্বতীর যে ধ্যান আছে তাহা এইরূপ—

"ত্রিমুখাং ষড়্‌ভুজাং রক্তাং সরস্বতীং ভাবয়েদ্‌ব্রতী।
পদ্মহস্তাধরাং সৌম্যাং প্রজ্ঞাবর্ধনহেতবে ॥"

তন্ত্রে সরস্বতী

তন্ত্রে সরস্বতীর নানাপ্রকার রূপকল্পনা আছে। কিন্তু সকল রূপেই তিনি মাতৃকামূর্তিতে প্রকটিত। হিন্দুতন্ত্রে ও বৌদ্ধতন্ত্রে সরস্বতীর এই ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ যে মহাসরস্বতী, বজ্রবীণা-সরস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্য-বজ্রসরস্বতী মূর্তির ধ্যান দিয়াছেন সেগুলিরও মূল মাতৃকামূর্তি। কালী, তারা প্রভৃতির ধ্যানে যে ভাব ফুটিয়া ওঠে, মহাসরস্বতী প্রভৃতির ধ্যানেও সেই ভাব ও তত্ত্ব

চিত্র—২৮

মহাসরস্বতী—বৌদ্ধ

অনুস্যূত। বৌদ্ধতান্ত্রিক মূর্তিগুলি দেখিলেই স্পষ্ট তাহা বোঝা যাইবে। হিন্দুতন্ত্রে অষ্ট তারিণীগণের মধ্যে সরস্বতী স্থান পাইয়াছেন। তন্ত্রসার বলিতেছেন—

"তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রকালী সরস্বতী।
কামেশ্বরী চ চামুণ্ডা ইত্যষ্টৌ তারিণীগণাঃ ॥"

তন্ত্র-সরস্বতীকে মাতৃকামূর্তি বলিয়া থাকেন।

নীল-সরস্বতী

তন্ত্রের নীল-সরস্বতীও মাতৃকামূর্তি। ইনি দ্বিতীয়া বিদ্যা তারা। ইঁহার মন্ত্র—"তারাদ্যা পঞ্চবর্ণেয়ং শ্রীমন্নীলসরস্বতী। সর্বভাষাময়ী শুদ্ধা সর্বদেবৈর্নমস্কৃতা" (ওঁ হ্রীং হুং ক ফট্)। তন্ত্রসারে পাওয়া যায় যে ইনি নীলবর্ণা—"নীলা চ বাক্‌প্রদা চেতি তেন নীলসরস্বতী।" ইঁহার আরাধনায় সৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে। নীল-সরস্বতীর স্তোত্রেও তাহার পরিচয় আছে। যথা—"মাতর্নীলসরস্বতি! প্রণমতাং সৌভাগ্য-সম্পৎপ্রদে।" শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যও এই নীল-সরস্বতীকে মাতৃকাদেবীরূপে ধ্যান করিয়াছেন। ইনি যে তারা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তন্ত্রে নীল-সরস্বতীর একটী নাম "মহাশ্রী।" ইঁহারা সকলেই মাতৃকা সরস্বতী—মহাবিদ্যা।

তন্ত্রে মহানীলসরস্বতীর কথা পাওয়া যায়। দু-এক জায়গায় "মহালীলসরস্বতী"ও আছে। ইনি তারা। তন্ত্রসার বলেন, "লীলয়া বাক্‌প্রদা চেতি তেন লীলসরস্বতী। তারাস্বররহিতা ত্র্যর্ণা মহালীলসরস্বতী।"

প্রপঞ্চসার-তন্ত্রের সপ্তম পটলে জপের কথা আছে। ইহার পূর্বে মাতৃকান্যাস। এই মাতৃকামন্ত্রের ঋষি হইলেন—ব্রহ্মা, ছন্দঃ—গায়ত্রী এবং দেবতা—সরস্বতী। সরস্বতীর ছয় অঙ্গ বর্ণমালার সমস্ত বর্ণ।

এই তন্ত্রে মাতৃকামূর্তি সরস্বতীর একটি ধ্যান আছে। ধ্যানটি এই ঃ

"পঞ্চাশদ্বর্ণভেদৈর্বিহিতবদনদোঃপাদযুক্‌কুক্ষিবক্ষো-
দেশাং ভাস্বৎকপর্দাকলিতশশিকলামিন্দুকুন্দাবদাতাম্।
অক্ষস্রক্‌কুম্ভচিন্তালিখিতবরকরাং ত্রীক্ষণাং পদ্মসংস্থা-
মচ্ছাকল্পামতুচ্ছস্তনজঘনভরাং ভারতীং তাং নমামি ॥" ৭।৩

এই ধ্যানের দেবী পদ্মাসনা, ত্রিনয়না, ভাস্বদ্মূর্তি। তিনি ইন্দু ও কুন্দের ন্যায় শুভ্র। পঞ্চাশটি বর্ণ দিয়া তাঁহার মুখ, পা, হাত ও বক্ষোদেশ বিহিত। মস্তকের উপরে কেশগুচ্ছ ও শশিকলা। দেবীর উপরের দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা বা জ্ঞানমুদ্রা, নীচের দক্ষিণহস্তে চিন্তা, উপরের বামহস্তে কুম্ভ, নীচের বামহস্তে পুস্তক। একাদশ পটলে প্রকৃতির স্তব আছে। পঞ্চম শ্লোকে তাঁহাকে সরস্বতী বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এই সরস্বতীও পূর্ববর্ণিত ভারতী-দেবীর ন্যায়। কেবল পার্থক্য এই

যে, হাতে পুস্তকের পরিবর্তে লেখনী ; আর দেহে অক্ষরের কোন বিধান নাই। ধ্যানটি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"সচিন্তাক্ষমালা সুধাকুম্ভলেখাধরা ত্রীক্ষণার্ধেন্দুরাজৎকপর্দা।
সুশুক্লাংশুকাকল্পদেহা সরস্বত্যপি ত্বন্ময়ৈবেশিবাচামধীশা ॥"

ভারতীর নবশক্তি। তাঁহাদের নাম—মেধা, প্রজ্ঞা, প্রভা, বিদ্যা, ধী, ধৃতি, স্মৃতি, বুদ্ধি, বিদ্যেশ্বরী।*

সাধক সরস্বতী, তাঁহার শক্তি ও আবরণ-দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। পূজায় গন্ধ, পুষ্প, দীপ, ধূপ ও অন্ন আবশ্যক।

তন্ত্রে অক্ষরের মূর্তি আছে। স্বরবর্ণের কেশব, নারায়ণাদি ১৬টি বৈষ্ণব মূর্তি। এই ১৬ মূর্তির ১৬টি শক্তি। তন্মধ্যে সরস্বতী হইলেন সঙ্কর্ষণের শক্তি।

নারদপঞ্চরাত্রাগমের তৃতীয় রাত্রির প্রথম অধ্যায়ে দ্বাদশ সংখ্যক বৈষ্ণবমূর্তি সঙ্কর্ষণের শক্তি সরস্বতী বলিয়া উল্লিখিত।

ব্যঞ্জনবর্ণের রুদ্রমাতৃকা, মহাকালী, সরস্বতী, সর্বসিদ্ধি, গৌরী, ভদ্রকালী প্রভৃতি ৩৫টি মূর্তি।

প্রপঞ্চসারের ২৩ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে আছে—

"দংষ্ট্রায়াং বসুধা সশৈলনগরারণ্যাপগা হুংকৃতো
বাগীশী…!"

জলমগ্না পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বরাহ অবতার হইয়াছিলেন। বরাহাবতারের দংষ্ট্রায় পৃথিবী এবং তাঁহার হুঙ্কারে সরস্বতী ছিলেন।

এগুলি সমস্তই মাতৃকামূর্তি। সকলেই মহাবিদ্যা। মাতৃকাদেবীর পূজা বহুপ্রকারে হইয়া থাকে। তাঁহার বয়স কল্পনা করিয়া লইয়া বয়স অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামও দেওয়া হইয়া থাকে। দেবী এক বৎসরের হইলে 'সন্ধ্যা,' দুই বৎসরের হইলে 'সরস্বতী,' সাত বৎসরের হইলে 'চণ্ডিকা,' আট বৎসরের হইলে 'সম্ভাবী' ইত্যাদি।

প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন একখানি তন্ত্রে কয়েকটি পূর্ণফলপ্রদা মহাবিদ্যার নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে "বাসলী" ও বাগ্‌বাদিনীর নামও আছে। এই তন্ত্রখানির নাম "মালিনীবিজয়তন্ত্র"। এই তন্ত্র হইতে ক্ষেমরাজ অতি প্রাচীন বচন বলিয়া শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ক্ষেমরাজ অভিনবগুপ্তের শিষ্য। ইহাতে বর্ণিত মহাবিদ্যার নাম এইরূপ :

"অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে।
দোষজালৈরসংস্পৃষ্টাস্তাঃ সর্বাহি ফলৈঃ সহ ॥

---

* মেধা প্রজ্ঞা প্রভা বিদ্যা ধীধৃতিস্মৃতিবুদ্ধয়ঃ।
বিদ্যেশ্বরীতি সংপ্রোক্তা ভারত্যা নব শক্তয়ঃ ॥ প্রপঞ্চসার ৭।৯

চিত্র—২৯

বজ্রসরস্বতী—বৌদ্ধ

কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ ॥
কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥"

এই 'বাসলী' তন্ত্রসম্মতা মহাবিদ্যা। বাসলী বাগীশ্বরী শব্দের রূপান্তর। বাগীশ্বরী—বাইসরী*—বাসরী—বাসলী। এ শব্দটি হাজার বছর পূর্বে তন্ত্রশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে। কেমন করিয়া বাসলী তন্ত্রে প্রবেশ লাভ করিল তাহা জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ বাগীশ্বরী শনৈঃ শনৈঃ বাসলীতে পরিণত হইয়া থাকিবে। বাসলী যে সরস্বতীমূর্তি তাহা মনে করিবার মত কারণও আছে। গয়ার বিষ্ণুপাদমন্দিরের প্রধান চত্বরে প্রবেশের জন্য দ্বিতীয় স্তরে যে দ্বার আছে এবং যেখানে মালীরা বসিয়া ফুল-জল-নৈবেদ্যাদি বিক্রয় করে, সেই দ্বারের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরগাত্রে এক কুলুঙ্গীতে দেবী সরস্বতীর চতুর্ভুজা, বীণাপুস্তকহস্তা স্মিতবদনা অতি প্রাচীন একটি প্রস্তরপ্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী সেখানে 'বাসিরী' (বাগীশ্বরী) নামে প্রসিদ্ধা।

বীরভূম জেলায় নানুরে চতুর্ভুজা একটি সরস্বতীমূর্তি আছে। এই দেবীর নামও 'বাসলী'। বাঁকুড়ায় বেলেতোড়ে আর একটি 'বাসলী' মূর্তি আছে। এটিও সরস্বতীমূর্তি; আরও অনেক জায়গায় 'বাসলী' দেবীর মূর্তি আছে। সকলগুলি দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই। যদি সমস্ত বাসলীমূর্তি বাগীশ্বরী সরস্বতীর মূর্তি হয় তাহা হইলে বাসলী ও বাগীশ্বরী অভিন্ন বলা যাইতে পারে। নানুরের বাসলী মাতৃকাদেবী। ইনিও সরস্বতীমূর্তি। নানুরের বাসলীদেবীর নিকটে শারদীয়া পূজার সপ্তমীর দিন হইতে বলির ব্যবস্থা আছে। নবমীর দিন পর্যন্ত ছাগ, মহিষ ও

---

* জৈন-প্রাকৃতে 'বাইসরী' 'বাএসিরী' হইয়াছে। তপগচ্ছীয় শ্রাবকপ্রতিক্রমণান্তর্গত 'কল্যাণকংদং' স্তুতির শেষ (চতুর্থ) গাথায় এই 'বাএসিরী' পদটি পাওয়া যায়। গাথাটি এই—

'কুন্দিন্দু গোক্খীর-তুসারবন্না
সরোজহত্থা কমলে নিসন্না
বাএসিরী পুত্থয়বগ্গহত্থা
সুহায় সা অম্হসয়াপসত্থা।

সংস্কৃতছায়া—

কুন্দেন্দুগোক্ষীরতুষারবর্ণা
সরোজহস্তা কমলে নিষণ্ণা
বাগীশ্বরী পুস্তকবর্গহস্তা
সুখায় সা নঃ সদা প্রশস্তা।

একটি মেষ বলি দিবার বিধি আছে। এছাড়া অন্যান্য সময়েও লোকে বলি মানসিক করিয়া যায়, সময় মত বলি আনিয়া পুরোহিত দ্বারা নিবেদন করিয়া দেয়। এই দেবীর নবপত্রিকা স্নানের সময় হাড়িরা পথে এই দেবীর উদ্দেশে একটি শূকর বলি দেয়।

জৈনদেবী সরস্বতী

(চিত্র—৩৫ক)

মথুরায় জৈনদিগের প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মথুরায় শ্বেতাম্বর জৈনদিগের একটি স্তূপের মধ্যে কয়েকটি মন্দির আছে। ঐ মন্দিরগুলির মধ্যে প্রথম বা দক্ষিণ-পূর্ব দিকের নিকটে ১৮৮৯ সালে বাক্ ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্তিটির আকার ১ ফুট ১০ ইঞ্চি×১ফুট ৩½ ইঞ্চি। মূর্তিটির মস্তক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দেবী জানু উঁচু করিয়া একটি চতুষ্কোণ পাদ-পীঠের উপর বসিয়া আছেন। দেবীর বাম হস্তে একখানি পুঁথি। দক্ষিণ হস্তটির উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তবে যতটুকু আছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় হাতটি উর্ধ্বে উত্তোলিত ছিল। দেবী বস্ত্রপরিহিতা। সরস্বতীর দুই দিকে দুইজন উপাসকের ছোট ছোট মূর্তি। বামদিকের মূর্তিটির হাতে কলসী, তাহার পরিধানে ঢিলা পরিচ্ছদ—কটিদেশে পেটি দিয়া আঁটা; দক্ষিণদিকে উপাসক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান। (চিত্র—৩৫)

এই সরস্বতী মূর্তিটি লৌহ-নির্মিত। এই মূর্তির নিম্নভাগে সাতটি ছত্রে একটি লিপি আছে। শেষ ছত্রটি অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। লিপিটি ৮৪ শকাব্দে (১৬২ খ্রীস্টাব্দে) ক্ষোদিত। মূর্তির নিম্নে লিপির পাঠ এইরূপ ঃ

১। [সিদ্] ধম্ সক ৮৪ হিমংত মাসে চতুর্থে ৪ দিবসে ১১ অ—

২। স্য পূর্ব্বায়াং কোট্টিয়াতো [গ] ণাতো স্থানি [য়] া তো কুলাতো।

৩। বৈরাতো শাখাতো শ্রীগৃহ [া] তো সংভোগাতো বাচকস্যার্য্য

৪। [হ] স্তহস্তিস্য শিষ্যো গণিস্য অর্য্যমাঘ হস্তিস্য শ্রদ্ধচরো বাচকস্য অ—

৫। য্য দেবস্য নির্ব্বর্ত্তনে গোবস্য সীহপুত্রস্য লোহিক কারু কস্য দানং

৬। সর্ব্বসত্ত্বানাং হিতসুখা এক সরস্বতী প্রতিষ্ঠাবিতা অবতলে রঙ্গানর্তনো

৭। মে—[॥]

অনুবাদ—৮৪ অব্দের হেমন্ত মাসের ৪ চতুর্থে, একাদশ (চান্দ্র) দিবসে সীহপুত্র লোহিককারু 'গোব' নামক ব্যক্তির দানে, কোট্টিয়গণ, স্থানিয়কুল, বৈরশাখা ও শ্রীগৃহসম্ভোগ হইতে উৎপন্ন বাচক আর্য হস্তহস্তির শিষ্য গণি আর্য মাঘহস্তির শ্রদ্ধচার বাচক আর্যদেবের দৃষ্টান্তে—সর্বসত্ত্বাদিগের হিতের জন্য রঙ্গানর্তনের অবতলে এক সরস্বতী (প্রতিমা) প্রতিষ্ঠাপিত হইল।

চিত্র—৩০

ক

বজ্রসারদা—বৌদ্ধ

খ

আর্যসরস্বতী—বৌদ্ধ

এই সরস্বতী-মূর্তির নিম্নস্থ লিপিতে "কোট্টিয়গণ," "স্থানিয়কুল," "বৈরশাখা" ও "শ্রীগৃহসম্ভোগের"র উল্লেখ দেখা যাইতেছে। এগুলি সমস্তই সেই সময়ের জৈন-ব্যাপার। এই লিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে অন্ততঃ শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মধ্যে সরস্বতী অর্চনা তৎকাল-প্রচলিত জৈনধর্ম-প্রণালীর অনুমোদিত ছিল।* তাহা না হইলে মূর্তি-সম্বলিত এই লিপির অস্তিত্বের কোন অর্থ হয় না।

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অতি প্রাচীন কালে হিন্দু ও জৈন বলিয়া কোন পৃথক্ সম্প্রদায় ছিল না। ধর্মের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে মতভেদ হওয়ায়, বিশেষতঃ হিংসার অনুষ্ঠান বিষয়ে ইঁহাদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ হওয়ায়, একটি সতন্ত্র সম্প্রদায় ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে। ইঁহারা তীর্থঙ্করগণকে মহাপুরুষ বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং জৈন নামে অভিহিত হ'ন। ইঁহারা বলেন, ভগবানের মুখ-নির্গতা বাণীই শ্রুত। ইঁহাদের মতে শ্রুত ও সরস্বতী অভিন্ন। সরস্বতীকে ইঁহারা "শ্রুতদেবী" বলিয়া থাকেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত জৈন-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—তীর্থঙ্করগণ শ্রুতদেবীকে নমস্কার করিতেন।† জ্ঞাতা ধর্মকথাসূত্রে (১ শ্রুঃ ৪ বর্গ ১ অঃ) বর্ধমানাদির সহিত সরস্বতীর নমস্কার আছে ঃ

"নমঃ শ্রীবর্ধমানায় শ্রীপাশ্বপ্রভবে নমঃ।
নমঃ শ্রীমৎসরস্বত্যৈ সহায়েভ্যো নমো নমঃ॥"

অখিল বিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেবীর নাম তাঁহারা শ্রুতদেবী দিয়াছেন। শ্রুত সম্বন্ধে দিগম্বর জৈনদিগের গ্রন্থে একটি উপদেশ আছে। তাঁহাদের শাস্ত্র বলেন, শেষ তীর্থঙ্কর শ্রীবর্ধমান মহাবীর স্বামী মোক্ষমার্গের উপদেশ দান করেন। শ্রাবণ মাসের প্রতিপদ্ তিথিতে সূর্যোদয়ের সময়ে রৌদ্র মুহূর্তে যখন চন্দ্র অভিজিৎ নক্ষত্রে ছিল, সেই সময়ে তিনি এই উপদেশ প্রদান করিয়া সংসারদুঃখকাতর জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। ইন্দ্রভূতি গৌতম গণধর ঐদিন সন্ধ্যাকালে ভগবান্ মহাবীরের এই বাণীকে একাদশ "অঙ্গ" ও চতুর্দশ "পূর্ব" রূপে বিভক্ত করেন। অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে এই ১১ অঙ্গ ও ১৪ পূর্বের অন্তর্গত করিয়া তাঁহার সহধর্মী সুধর্মা স্বামীকে উপদেশ দেন। তিনি আবার জম্বুস্বামীকে উপদেশ করেন। জম্বুস্বামী অনেক মুনি ঋষিকে এই দ্বাদশাঙ্গ শ্রুত উপদেশ করেন এইরূপে এই শ্রুতের প্রচার হয়। জৈনদিগের মতে ইহা ২৪৫৫ বর্ষ পূর্বের কথা।

শ্রবণ বেলগোলায় একটি অষ্টধাতুর "শ্রুতস্কন্ধযন্ত্র" বা "সরস্বতী-যন্ত্র" আছে।

*Guerinot : Jaina Bibliographie

† কোটীশতং দ্বাদশ চৈব কোটী, লক্ষাণ্যশীতিস্ত্র্যধিকানি চৈব।
পঞ্চাশদষ্টৌ চ সহস্রসংখ্যামেতচ্ছ্রুতং পঞ্চপদং নমামি। ইত্যাদি

(চিত্র—৪৯) এই যন্ত্র এই দ্বাদশাঙ্গ বাণীর। ইহাতে ১১ অঙ্গ, ১৪ পূর্ব ৫ প্রকীর্ণক ও ১৪ অঙ্গবাহ্য বাণীর বর্ণনা আছে। ইহাদের শ্লোক-সংখ্যাও অঙ্কিত আছে। সকলের নীচে প্রথম প্রকোষ্ঠে ভেদমতিজ্ঞানের ৩৩৬ শ্লোক, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে জ্ঞানবিকলা ২০ গ্রন্থ, অঙ্গ ১২, অঙ্গবাহ্য ১৪। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রুতজ্ঞানের অক্ষরসংখ্যা ১৮৪৪৬৭৪৪০, ৭৩৭০,৯৫৫১৬১৫। ইহার পর চতুর্থ প্রকোষ্ঠে একপদ-বর্ণসংখ্যা ১৬৩৪৮৩০৭৮৮৮, পঞ্চম প্রকোষ্ঠে দ্বাদশাঙ্গ নামপদসংখ্যা ১১২৮৩৫৮০০৫, ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে একাদশাঙ্গ পদসংখ্যা ৪১৫০২০০০। ইহার পর শ্লোকসংখ্যার সহিত ১১ অঙ্গ আছে। দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠে শ্লোকসংখ্যার সহিত ৫ প্রকীর্ণক এবং বামদিকের প্রকোষ্ঠে শ্লোকসংখ্যার সহিত ৫ চুলিকা আছে। যেখান হইতে শ্রুতস্কন্ধ বা সরস্বতীর শাখা বাহির হইয়াছে, সেখানে শ্লোকসংখ্যার সহিত ১৪ পূর্ব আছে। সকলের উপর ধ্বজদণ্ডের আকারে অঙ্গবাহ্য ১৪ এবং ইহার ধ্বজায় অক্ষর-সংখ্যা আছে। এই ১১ অঙ্গ ও ১৪ পূর্ব শ্রুতের পঠনপাঠন শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ইঁহার সময় মহাবীরের ১৬২ বর্ষ পরে।

ইহার পর অঙ্গজ্ঞানের অবনতি হইতে থাকে। ক্রমশঃ পতনোন্মুখ অঙ্গজ্ঞানের কিছু কিছু বীর-নির্বাণ সংবৎ ৬৮৩ পর্যন্ত ছিল। কিছুকাল পরে অর্হৎ বলী মুনি আসেন। ইনি মুনিগণের মধ্যে সংঘ-স্থাপন করেন। ইঁহারই সময়ে দিগম্বর আম্নায়সারী মুনিদিগের চারি বিভাগ হয়।

অর্হৎ বলীস্বামীর কিছুকাল পরে ধরসেনাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অগ্রায়ণী পূর্বের অন্তর্গত পঞ্চম বস্তুর মধ্যে চতুর্থ যে মহাকর্ম প্রাভৃত তদ্‌জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। অর্থাৎ উপরি-উক্ত শ্রুতজ্ঞানের এক অংশের জ্ঞাতা ছিলেন। ইনি শ্রুতজ্ঞান রক্ষার জন্য পুষ্পদন্ত ও ভূতবলী মুনিকে ইহা উপদেশ করেন।

ভূতবলী স্বামী দেখিলেন যে প্রতিদিন বিদ্যার অবনতি হইতেছে ; যাহা কিছু মৌখিক জ্ঞান আছে তাহাও নষ্ট হইয়া যাওয়া সম্ভব। এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং মনুষ্যের স্মৃতিশক্তির দিন দিন হ্রাস হইতেছে দেখিয়া তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই গ্রন্থের নাম "ষট্‌খণ্ডাগম"। ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া জ্যেষ্ঠশুক্লা পঞ্চমীর দিন চারি সংঘ একত্র করিয়া বেষ্টনাদি উপকরণ দ্বারা মহাসমারোহে "ষট্‌-খণ্ডাগমের" পূজা করেন। আজ পর্যন্ত জৈনসমাজে ঐ তিথি "জ্ঞান-পঞ্চমী" নামে প্রসিদ্ধ। ঐ দিন জৈনধর্মাবলম্বী বিজ্ঞগণ বিধিপূর্বক নিজ নিজ শাস্ত্রের পূজা করিয়া থাকেন।

ভদ্রবলীর পর বহু জৈনাচার্য প্রয়োজনমত নানা বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন করেন। অতঃপর নবাঙ্কুরিত বৌদ্ধধর্ম তরুণাবস্থা লাভ করিলে, বহু রাজা মহারাজা ইহার অভিনবচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া জৈন-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। তবে এ সময়েও কয়েকজন প্রভাবশালী জৈনাচার্য

চিত্র—৩১

বজ্রসারদা

বড় বড় রাজসভায় গিয়া নির্ভীকভাবে অন্য মতের খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপনও না করিয়াছিলেন, তাহা নয়। তারপর বৌদ্ধাচার্যগণ অনেক জৈন-শাস্ত্র নষ্ট করিয়া জলে ফেলিয়া দেন, এমন কি মন্দির ও মূর্তি ভগ্ন করিয়া বৌদ্ধমূর্তি স্থাপন করেন। এই সময়ে অকলঙ্কাচার্য জন্মগ্রহণ করিয়া জৈনধর্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। রাষ্ট্রকূট-বংশীয় জৈনরাজ অমোঘবর্ষ ৬৬৪-৭২২ খ্রীস্টাব্দে (৭৩৬-৭৯৯ শকাব্দ) বর্তমান ছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে ইঁহার প্রধান গুরু জিনসেন আচার্য পুরাণ, ১৬ সংস্কার প্রভৃতি জৈনদিগের মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দেবদেবীর বহুব্যাপারও ইঁহারই দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। ইনি প্রথমে শ্রী, হ্রী, ধৃতি, কীর্তি, বুদ্ধি লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে নূতন করিয়া দেবী বলিয়া দেখাইলেন। জৈনগণ বলেন, যখন তীর্থঙ্কর মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হন, তখন ইঁহারা মাতার সেবা করেন, এবং মাতার মনে যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, ইঁহারা সেই সকলের উত্তর দিয়া থাকেন। জৈনগণ ইঁহাদিগকে 'ষট্‌কুমারিকা' বা 'সপ্তকুমারিকা' বলিয়া থাকেন।

সরস্বতী-সম্পর্কে জৈনদিগের একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। কাহিনীটি এই—জম্বুদ্বীপের প্রান্তভাগের সহিত অন্যান্য দ্বীপের বিভেদ করিবার জন্য হিমবান্‌ পর্বতের সৃষ্টি। সেই পর্বতে সাতটি হ্রদ আছে, সেগুলি খুব বড়। হ্রদগুলি হইতে অনবরত জল বাহির হয়। সেই জল নীচে আসিয়া পড়িয়া নদীতে পরিণত হয়। এই সকল হ্রদে এক-একটি কমল আছে। ঐ সকল কমলের উপর এক-একটি মহল আছে। প্রত্যেক মহলে একটি দেবী থাকেন। ইঁহারাই শাসনদেবী। এই শাসন-দেবীদের পূজারও ব্যবস্থা হইল। ক্রমশঃ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় জৈন সম্প্রদায় অনেকগুলি ব্রাহ্মণ্য-দেবতাকে নিজেদের ধর্মে স্থান দিলেন। প্রাচীন কাল হইতে জৈনগণ সরস্বতীকে গীর্বাণী রাগদেবতারূপে আরাধনা করিয়া আসিতেছেন। সরস্বতী তাঁহাদের মধ্যে একটি প্রধান দেবী। এক্ষণে ২৪ জন তীর্থঙ্করের শাসনদেবীগণেরও পূজা হইতে লাগিল। শাসনদেবীগণ তীর্থঙ্করদিগের শাসন বহন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যাদেবীরূপে ষোল জন শাসনদেবীর পূজারও ব্যবস্থা হইল। সরস্বতী বিদ্যার প্রধান অধিষ্ঠাতৃদেবী। বিদ্যাসম্পর্কিত নানা ব্যাপার ইঁহাদেরই সাহায্যে ইনি সম্পাদন করিয়া থাকেন। হেমচন্দ্রাচার্য তাঁহার "অভিধান চিন্তামণি"তে (দ্বিতীয় পর্যায়, ৯৩) এই ষোড়শ বিদ্যাদেবীর নাম দিয়াছেন—

"রোহিণী প্রজ্ঞপ্তী বজ্রশৃঙ্খলা কুলিশাঙ্কুশা
চক্রেশ্বরী নরদত্তা কাল্যথাসৌ মহাপরা॥
গৌরী গান্ধারী সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা চ মানবী।
বৈরোট্যাচ্ছুপ্তা মানসী মহামানসিকেতি তাঃ॥

সুতরাং শ্বেতাম্বরগণের মতে ষোড়শ বিদ্যাদেবী বলিলে আমরা বুঝিব—১ রোহিণী, ২ প্রজ্ঞপ্তী, ৩ বজ্রশৃঙ্খলা, ৪ কুলিশাঙ্কুশা, ৫ চক্রেশ্বরী, ৬ নরদত্তা, ৭ কালী, ৮ মহাকালী,

৯ গৌরী, ১০ গান্ধারী, ১১ জ্বালা, ১২ মানবী, ১৩ বৈরাট্যা, ১৪ অচ্ছুপ্তা, ১৫ মানসী, ও ১৬ মহামানসী।

শ্বেতাম্বর-মতে তীর্থঙ্করগণের ২৪ জন শাসন-দেবীর নাম, যথা—

চক্রেশ্বরী, অজিতা, দুরিতারী, কালী, মহাকালী, অচ্যুপ্তা, শান্তা, জ্বালা, সুতারকা, অশোকা, শ্রীবৎসা, প্রবরা, বিজয়া, অঙ্কুশা, পন্নগা, গৌরী, নির্বাণা, অচ্যুতা, ধারণী, বৈরাট্যা, গান্ধারী, অম্বা, পদ্মাবতী, সিদ্ধা।*

দিগম্বরমতে তীর্থঙ্করগণের ২৪ জন শাসন-দেবীর নাম, যথা—

চক্রেশ্বরী, রোহিণী, প্রজ্ঞপ্তী, বজ্রশৃংখলা, পুরুষদত্তা, মনোবেগা, কালী, মহাকালী, জ্বালামালিনী, মানবী, গৌরী, গান্ধারী, বৈরাট্যা বা বৈরোটি, অনন্তমতী, মানসী, মহামানসী, বিজয়া বা জয়া, অজিতা, অপরাজিতা, বহুরূপিণী, চামুণ্ডী, কুষ্মাণ্ডিনী, পদ্মাবতী, সিদ্ধায়িনী বা সিদ্ধায়িকা। এই শাসনদেবীগণকে ইঁহারা 'যক্ষিণী' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শাসনদেবীদের নামে উভয় সম্প্রদায়ে অতি অল্পই সাদৃশ্য আছে। আবার যেখানে নাম-সাদৃশ্য আছে, সেখানে অনেক সময় ধর্ম বা রূপসাদৃশ্য নাই।

বিদ্যাদেবীগণের মস্তকের উপর মন্দিরের আকারে উঁচু মুকুট। সকলেই ললিত মুদ্রাসনে আসীনা, একটি পা নীচু করিয়া রাখিয়াছেন, আর একটি পা সম্মুখের দিকে গুটান। সকলেরই দক্ষিণহস্ত বক্ষোপরি বরদমুদ্রায় স্থাপিত। বামহস্ত মোড়া এবং উঁচুতে তোলা।

ষোড়শ বিদ্যাদেবী

বিদ্যাদেবীর নাম	অপর নাম	লাঞ্ছন	হস্তের সংখ্যা
১ রোহিণী (চিত্র—৩৬ক)	অজিতবলা (শ্বে)	চৌকি	চার
২ প্রজ্ঞপ্তী (চিত্র—৩৬খ)	দুরিতারী (শ্বে)	হংস	ছয়
৩ বজ্রশৃংখলা (চিত্র—৩৬গ)		হংস	চার
৪ কুলিশাঙ্কুশা (চিত্র—৩৭ক)	মনোবেগা (দি) মনোগুপ্তী (দি) শ্যামা (শ্বে)	অশ্ব	চার

* তীর্থংকর······দেব্যঃ। দেবীও চক্কেসরি অজিআ দুরিতারি কালী মহাকালী।
অচ্চুয় সন্তা জালা সুতারাহসোয় সিরিবচ্ছা॥ ৩৮৮
পবর বিজয়ংহকুসা পন্নগত্তি নিব্বাণ অচ্চুয়া ধরণী।
বইরুট্টহবুত্ত গন্ধারি অম্ব উপমবঈ সিদ্ধা॥ ৩৮৯

চিত্র—৩২

ক

সারনাথের সরস্বতী

খ
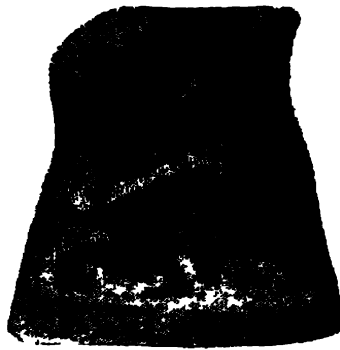
পালযুগের বৌদ্ধ সরস্বতী

বিদ্যাদেবীর নাম	অপর নাম	লাঞ্ছন	হস্তের সংখ্যা
৫ চক্রেশ্বরী (চিত্র—৩৭খ)		গরুড়	ষোল
৬ পুরুষদত্তা (চিত্র—৩৭গ)		হস্তী	চার
৭ কালী (চিত্র—৩৮ক)	শান্তা (শ্বে)	নন্দী বা বৃষ	চার
৮ মহাকালী (চিত্র ৩৮খ)	অজিতা (দি)	০	চার
	সুতারকা (শ্বে)	০	চার
৯ গৌরী (চিত্র—৩৮গ)	মানবী (শ্বে)	পদতলে বৃষ	চার
১০ গান্ধারী (চিত্র—৩৯ক)	চণ্ডা (শ্বে)	০	চার
১১ সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা (চিত্র—৩৯খ)	জ্বালামালিনী (দি) ভৃকুটী (শ্বে)	বৃষ	আট
১২ মানবী (চিত্র—৩৯গ)	অশোকা (শ্বে)	০	চার
১৩ বৈরাট্যা (চিত্র—৪০ক)	বৈরোটী	সর্প	চার
১৪ অচ্ছুপ্তা (চিত্র—৪০খ)	অনন্তবতী (দি) অঙ্কুশা (শ্বে)	হংস	চার
১৫ মানসী (চিত্র—৪০গ)	কন্দর্পা (শ্বে)	সিংহ	চার
১৬ মহামানসী (চিত্র—৪০ঘ)	নির্বাণী (শ্বে)	ময়ূর	চার

সরস্বতী জ্ঞান ও কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জৈনমন্দিরে ও জৈন গৃহস্থের বাড়িতে সরস্বতী-মূর্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনগণ সরস্বতীকে শাসন-দেবীরূপেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। প্রোলের অনুমকোণ্ড-লিপিতে * শাসনদেবীরূপে সরস্বতীর উল্লেখ আছে।

উত্তরদিকে লিপিতে

পঙ্‌ক্তি

৫০ অতিশয়-জৈনধর্ম-সময়োচিত
৫১ শাসনদেবি ভারতী সতি শসি (শ) বিম্ব-ব (ক্ত্র)-
৫২ দশনচ্ছদে শুদ্ধ-স্বর্ণ (র্ণ '-কুম্ভ-সন্নুত-ত-
৫৩ নুবর্ণ (র্ণ)-পীবর-[প] য়োধরি মৈল [ম যা]-
৫৪ [ক] মাম্বিকা। সু-[ত]-তদমাত্য-[বে] ত- [হৃ]-
৫৫ দয়েশ্বরি নিশ্চল লক্ষ্মী ভাবিস লু [॥]

অনুবাদ

[যা] কমাম্বিকার পুত্র অমাত্য বেতের হৃদয়েশ্বরী ছিল মৈলম; ইঁহার বদন চন্দ্রের ন্যায় [সুন্দর], ইঁহার ওষ্ঠ বিম্বের ন্যায় [রক্তবর্ণ], ইঁহার তনুর বর্ণ সুন্দর

*Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 257

বলিয়া ও ই*হার পীবর পযোধর বিশদ্ধ সুবর্ণকুম্ভ বলিয়া প্রশংসিত এবং ইনি [যেন স্বয়ং] জৈনধর্মতোচিত শাসনদেবী ভারতী ছিলেন এবং নিশ্চিতই অচঞ্চল লক্ষ্মীদেবী ছিলেন।

জৈনগণ জীবের চারিটি বিভাগ করিয়া থাকেন—মনুষ্য, তির্যক্, দেব ও নারকী। এই দেবযোনি চারিভাগে বিভক্ত—ভবনবাসী, ব্যন্তর, জ্যোতিষ ও বৈমানিক।

ব্যন্তর দেবতাদিগের মধ্যে চারিটি গন্ধর্বমহাদেব, তন্মধ্যে একটি মহাদেবের নাম—গীতযশ ; ই*হার দুইজন মহাদেবী,—স্বস্বরা ও সরস্বতী। এটি শ্বেতাম্বর-মত।

দিগম্বরদিগের মতে চারিজন গন্ধর্বমহাদেবের মধ্যে একজনের নাম 'গীতরতীন্দ্র' বা 'গীতরতি'। ই*হার দুইজন মহাদেবী, নাম—স্বরসেনা ও সরস্বতী।*

সরস্বতী গন্ধর্বেন্দ্র গীতরতির অগ্রমহিষী।

আমাদের নিত্যকর্মপদ্ধতির মত শ্বেতাম্বরদের একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ আছে, নাম—রত্নসাগর। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সরস্বতীর একটি ধ্যান আছে। ধ্যানটি এই :

"শ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ। শ্রীসারদায়ৈ নমঃ।
সরস্বতি মহাভাগে। বরদে কামরূপিণি।
বিশ্বরূপি বিশালাক্ষি। ত্বে বিদ্যে পরমেশ্বরি।
সরস্বতী ময়া দৃষ্টা। বীণাপুস্তকধারিণী।
হংসবাহনসংযুক্তা। বিদ্যাদান-বরপ্রদা॥"

সরস্বতীর আর একটি ধ্যান তপগচ্ছীয় শ্রাবক প্রতিক্রমণ-সূত্রান্তর্গত 'কল্যাণকন্দং' স্তোত্রের শেষে আছে। ধ্যানটি এই :

"কুন্দিন্দু গোক্খীর-তুষারবন্না।
সরোজহত্থা কমলে নিসন্না।
বাএসিরী পুত্থয়বগ্গহত্থা
সুহায় সা অম্হসয়াপসত্থা।"

ইহার সংস্কৃতচ্ছায়া—

"কুন্দেন্দুগোক্ষীরতুষারবর্ণা
সরোজহস্তা কমলে নিষণ্ণা
বাগীশ্বরী পুস্তকবর্গহস্তা
সুখায় সা নঃ সদা প্রশস্তা।"

ভক্তামর মন্ত্রের মধ্যে সরস্বতীর একটি মন্ত্রও পাওয়া যায়। মন্ত্রটি এইরূপ :

"ওঁ হ্রীং শ্রাং শ্রীং শ্রূং হং সং থ থ থঃ ট টঃ
সরস্বতী বিদ্যাপ্রসাদং কুরু কুরু স্বাহা।"

---

* W. Kirfel : Die Kosmographie der Inder

চিত্র—৩১

প্রজ্ঞাপারমিতা

খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকের পরে জৈনগণ সরস্বতীর বহু স্তোত্র, মন্ত্র, অষ্টক প্রভৃতি রচনা করেন। জৈনটীকাকারগণের মধ্যে অনেকে সরস্বতীর আরাধনাও করিয়াছেন। স্থানাঙ্গসূত্রের টীকায়* আছে—

যস্যাঃ সংস্মৃতিমাত্রাদ্ ভবন্তি মতয়ঃ সুদৃষ্টপরমার্থাঃ।
বাচশ্চ বোধবিকলা সা জয়তু সরস্বতী দেবী॥

পঞ্চকল্পভাষ্যও† লিখিয়াছে—

সব্বং সুয়সমূহমতী বামকরে পাঁহ্‌য়পোখিয়া দেবী।
জব্বক্‌কুহ্ণ্ডী সাঁহয়া দেস্তু অবিগ্‌ঘং মমংনাণং॥

'শ্রীরত্নসারভাগবীজো' ‡ নামক গ্রন্থে সরস্বতী-স্তোত্রে বিদ্যাদেবীর ষোলটি নামের উল্লেখ আছে। স্তোত্রটি ব্যাকরণদুষ্ট হইলেও উপভোগ্য বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

অথ সরস্বতীস্তোত্রং লিখ্যতে

"নমস্তে সারদাদেবি! কাশ্মীর-পুরবাসিনি।
ত্বামহং প্রথমে নাথে। বিদ্যাদানং প্রদেহি মে॥ ১
প্রথমং ভারতীনামং। দ্বিতীয়ং সরস্বতী।
তৃতীয়ং সারদাদেবী। চতুর্থং হংসগামিনী॥ ২
পঞ্চমং বিদুষাংমাতা। ষষ্ঠং বাগেশ্বরী তথা।
কুমারী সপ্তমং প্রোক্তং। অষ্টমং ব্রহ্মচারিণী॥ ৩
নবমং ত্রিপুরাদেবী। দশমং ব্রাহ্মণী তথা।
একাদশং তু ব্রহ্মাণী। দ্বাদশং ব্রহ্মবাদিনী॥ ৪
বাণী ত্রয়োদশং নামং। ভাষা চেব চতুর্দশং।
পঞ্চদশং শ্রুতদেবী। ষোড়শং কৌণী গদ্যতে॥ ৫
এতানি সুধনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
তস্য সংতোষ্যতে দেবী। সারদাবরদায়িনী॥ ৬
যা কুন্দেন্দু তুষার-হার ধবলা............
....নিঃশেষজাড্যাপহা॥ ৭
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন। কাব্যং কুর্বন্তি মানবাঃ।
তস্মাৎ নিশ্চলভাবেন। পূজনীয়া সরস্বতী॥ ৮
সরস্বতীমদ্য দৃষ্টা। দেবী কমললোচনা।
হংসযানসমারূঢ়া। বীণাপুস্তকধারিণী॥ ৯

---

* ষোড়শপ্রকরণ, ১ বিব ৪ ঠ' ১ উ'
† ৫ কল্প'
‡ পৃষ্ঠা ৪৮০, ৪৮১ [১৯২৩ সংবতে বোম্বাই হইতে হীরাচাঁদজী কর্তৃক সংকলিত]

যা দেবী স্তূয়সে নিত্যং। বিবুধে বেদপারগে।
সা মাং ভবতু জিহ্বাগ্রে। ব্রহ্মরূপা সরস্বতী॥ ১০”

উক্ত গ্রন্থ (পৃ. ৪৮১) হইতে সরস্বতীর আর একটি স্তোত্র দেওয়া হইল ঃ

অথ সরস্বতীস্তোত্রং লিখ্যতে

“সরস্বতি নমস্যামি। চেতনাং হৃদিসংস্থিতাং।
কণ্ঠস্থাং পদ্মযোনিঞ্চ। হ্রীং হ্রীংকারী শুভপ্রিয়াং॥ ১
ঐ ঐ মন্ত্রপ্রদাং দাং। শুভাগং শোভনপ্রিয়াং।
পদ্মোপস্থাং কুণ্ডলিনী। শুক্লবস্ত্রাং মনোহরাং॥ ২
আদিত্যমণ্ডলস্থাঞ্চ। প্রণমামি জনপ্রিয়াং।
ইতি সম্যক্ স্তুতা দেবী। বাগীশেন মহাত্মনা॥ ৩
আত্মানং দর্শয়ামাস। সূর্যকোটিসমপ্রভং।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রস্তে। যৎ তে মনসি বর্ততে॥ ৪
বরদায় যদি মে দেবী। দিব্যজ্ঞানং প্রযচ্ছ মে।
দত্তেতে নির্মলং জ্ঞানং। কুবুদ্ধিধ্বংসকারিণং॥ ৫
স্তোত্রেণানেন যে ভক্ত্যা। মাং স্তুবন্তি যে নরাঃ।
তে লভন্তে পরং জ্ঞানং। মমতুল্যপরাক্রমং॥ ৭
ত্রিসন্ধ্যাং সর্বতো ভক্ত্যা। য ইদং পঠ্যতে সদা।
তস্য কণ্ঠে সদা বাসঃ। করিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥

কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথিতেও সরস্বতীস্তোত্রাদি আছে। স্থানাভাববশতঃ দেওয়া হইল না। তবে একখানি জীর্ণ পুঁথি হইতে একটি “সরস্বত্যষ্টকম্” নিম্নে প্রদত্ত হইল। পুঁথিখানি শ্রীযুক্ত পূরাণচাঁদ নাহার মহাশয়ের মূল্যবান্ পুস্তকাগারে রক্ষিত।

সরস্বত্যষ্টকম্

কর্পূরকুন্দরজনীকর ভাস্বরঙ্গী।
চংচৎসরোরুহমনোহরলোচনাঙ্গী।
নিত্যং স্মরামি নতদেবনরেন্দ্রনাঙ্গীং।
সদ্রত্নকুণ্ডলবিরাজিত গণ্ড ভামাং॥ ১
বীণাসুশোভিতকরাং সুভসপ্রধানাং
তাং ভারতীং হিতকরাং বরহংসযানাং
অজ্ঞানতামসহরাং ভজনষ্টদম্ভাং
স জ্ঞানস মুথরনির্জিত চ চন্দ্রশোভাং। ২

জৈন সরস্বতী (কঙ্কালীটিলা—মথুরা)

চিত্র—৩৫

নৃত্ত সরস্বতী

চিত্র—৩৬

ক

রোহিণী

খ

প্রজ্ঞপ্তা

গ

বজ্রশৃঙ্খলা
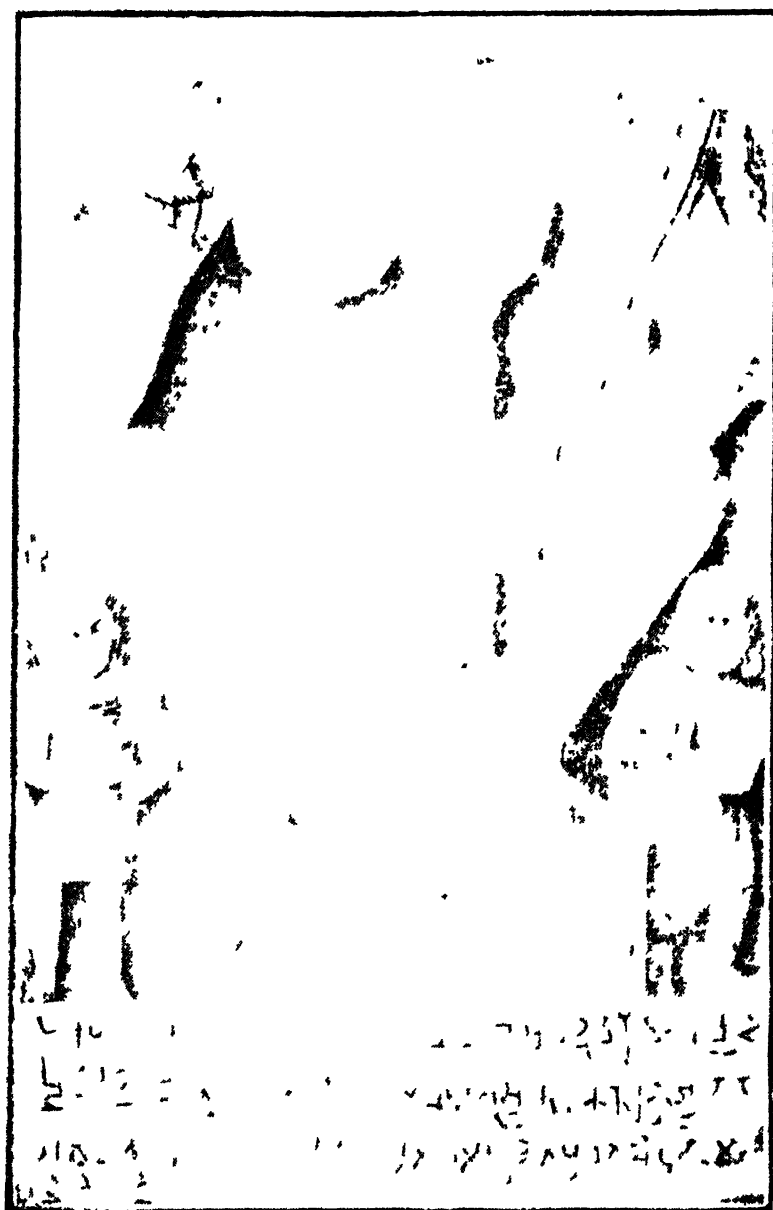
…স্মৌক্তিক প্রবরহারবিরাজমানাং
সম্যক্ নমামি সুরচামরবীজামানাং
মঞ্জীরচারুরঙ্গশোভিতপাদযুগ্মাং
তাং দেবতাং সুতনুভাং বরহস্তপদ্মাং
পীযুষসংভৃতকমণ্ডলধারিণী তাং
সেবে সুপক্বনবদামিম বীজদং তা ॥ ৩
অত্যুজ্জ্বল প্রবর কঙ্কণযুগ্মযুক্তাং ॥
বিদ্যাধনং প্রদধতীং মলরোগযুক্তাং ॥ ৪
কংকেল্লিপল্লবসুকোমলতারহস্তাং
লাবণ্যকেলিলহরীং বিস্মদাসয়াতাং
ভব্যোজনো নমতিকোনরুচাপবিত্রাং
সম্ভির্ভূতাং বিধিমুবামিলয়চ্চারিত্রঃ
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ব্লুং পূর্ব মংহং পশ্চান্বতঃ
সকল হ্লাং তত ঐঁ চযশ
তস্মান্নমোসংকৃতশেষকলানিদানং
মন্ত্রংমনোহরমিনং মমভাবয়ানাং
যো নির্মলেন মনসা বরলক্ষজাপং ।
মন্ত্রস্য যো প্রকুরুতেদমনেস্যপাপং ॥ ৫
সদুব্রহ্মচর্য সহিতঃ সুতপঃ ।
স দানান্তুর্ণং ভবৎ সকবিতাভুবনেপ্রধানঃ ॥ ৬
লক্ষং জপেতদানুপূর্ণকৃতে বিধেয়ং
হোম দশাসসহিতং ভুবনেম্পজেয়ং ॥ ৭
ইত্যষ্টক পঠীত যো মনসা বিশুদ্ধঃ ।
স্যাৎ সাধুকীর্তিনিলয়ঃ সুধাসিন্ধুবুদ্ধঃ ॥ ৮

ইীত শ্রীসরস্বত্যষ্টকং সমাপ্তম্

সরস্বতী গচ্ছ

জৈনাচার্য অর্হদ্বলী দ্বিতীয় ভদ্রবাহুর শিষ্য ছিলেন। ইনি অষ্টাঙ্গনিমিত্তজ্ঞান বেশ ভাল রকম জানিতেন। অঙ্গপূর্বদশের একদেশ সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। তাঁহার আরও দুটি নাম ছিল—গুপ্তিগুপ্ত এবং বিশাখাচার্য। ইনি বিক্রম সংবতের ২৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন! সেই সময়ের মুনিদের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত প্রভাব ছিল। মুনিরা তাঁর শাসন মানিয়া চলিতেন। প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর

তিনি মুনি-সংঘকে একত্র করিতেন। একবার তিনি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করেন—সকল যতি আসিয়াছেন কি না। তাহা শুনিয়া মুনিগণ উত্তর করেন—সকলে নিজের নিজের সংঘের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। আচার্য বলী তখন বুঝিলেন যে মুনিদের মধ্যে দল পাকাইবার চেষ্টা হইয়াছে, তাই তাঁহাদের এই 'পক্ষবুদ্ধি'। এখন ইঁহারা দল বাঁধিবেন এবং পক্ষপাত হেতুবশতঃ সংঘ, গণ ও গচ্ছের পক্ষ গ্রহণ করিবেন। সমতা-বুদ্ধি ও উদাসীনতা তাঁহাদের মধ্যে থাকা দুষ্কর হইবে। এই সমস্ত ভাবিয়া তিনি চারিটি সংঘ স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। বলী কর্তৃক ব্যবস্থিত চারিটি সংঘ নিম্নলিখিতরূপে স্থাপিত হয়—

১। মুনিগণের মধ্যে মাঘ নামক এক আচার্য মূল সংঘ স্থাপন করেন। তিনি বৃক্ষমূলে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সংঘের নাম 'মূলসংঘ' হয়। আর সেই বৃক্ষের নাম ছিল 'নন্দী,' তাই এই সংঘের আর একটি নাম 'নন্দী-সংঘ'। নন্দীসংঘে আবার আম্নায়, গচ্ছ ও গণ-ভেদ আছে। আম্নায়ের নাম নন্দ্যাম্নায়, গচ্ছের নাম—সরস্বতীগচ্ছ বা পারিজাত-গচ্ছ এবং গণের নাম—বলাৎকার-গণ। এই সংঘের আচার্যের উপাধি—নন্দী, চন্দ্র, কীর্তি ও ভূষণ। এই সংঘের প্রথম প্রবর্তকের নাম আচার্য মাঘনন্দী।

২। এই সংঘের প্রবর্তনকারী জিনসেন তৃণতলে বর্ষা কাটাইয়াছিলেন বলিয়া সেই সংঘের নাম হইল 'সেনসংঘ' বা 'বৃষভসংঘ'। সেনসংঘে পুষ্কর—গচ্ছ ও পুরস্থ—গণ। ইহার আচার্যের উপাধি চারিটি—রাজ, বীর, ভদ্র ও সেন।

৩। এই সংঘের প্রবর্তক সিংহের গুহায় বর্ষাত্যয় করিয়াছিলেন বলিয়া এই সংঘের নাম হয় 'সিংহসংঘ'। এই সংঘে চন্দ্রকপাট—গচ্ছ ও কেনুর—গণ। আচার্যের উপাধি—সিংহ, কুম্ভ, আস্রব ও সাগর।

৪। দেবদত্তা নামক বেশ্যার নগরে এই সংঘের প্রবর্তক বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্থাপিত সংঘের নাম দেবসংঘ। এই সংঘে পুস্তক—গচ্ছ ও দেশীয়—গণ। উপাধি—দেব, দত্ত, নাগ ও তুঙ্গ।

জৈনগণ বলিয়া থাকেন, গিরনার (উজ্জয়ন্ত-গিরি) পর্বতে পাষাণনির্মিত দেবী সরস্বতীর মূর্তি ছিল। আচার্য পদ্মনন্দী সরস্বতীর সহিত তাঁহার বিপক্ষবাদীদিগের তর্ক করাইয়াছিলেন। তখন হইতে মূল সংঘে সরস্বতী-গচ্ছের উৎপত্তি। আচার্য শুভচন্দ্র পাণ্ডবপুরাণের মঙ্গলাচরণে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণের উক্তি এইরূপ—

"কুন্দকুন্দোগ্রণী যেন জয়ন্তগিরিমস্তকে।
সোঽবদাদ্‌বাদিতা ব্রাহ্মী পাষাণঘটিতা কলৌ ॥"

নন্দীসংঘের পট্টাবলী ও শুভচন্দ্রের গুর্বাবলীতে এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া

চিত্র—৩৮

ক

কুলিশাংকুশা

খ

চক্রেশ্বরী

গ

পুরুষদত্তা ভারতী

নিম্নলিখিত বচনটি দেখিতে পাওয়া যায়—

> পদ্মনন্দিগুরুর্জাতো বলাৎকারগণাগ্রণী,
> পাষাণঘটিতা যেন বাদিতা শ্রীসরস্বতী ॥
> উজ্জয়ন্তগিরৌ গচ্ছঃ স্বচ্ছঃসারস্বতোঽভবৎ ।
> অতস্তস্মৈ মুনীন্দ্রায় নমস্তে পদ্মনন্দিনে ॥"

পট্টাবলীর উক্তি এইরূপ—

> শ্রীত্রৈলোক্যাধিপং নত্বা স্মৃত্বা সদ্গুরুভারতীম্ ।
> বক্ষ্যে পট্টাবলীং রম্যাং মূলসংঘগণাধিপাম্ ॥ ১
> শ্রীমূলসংঘপ্রবরে নন্দ্যাম্নায়ে মনোহরে ।
> বলাৎকারগণোত্তংসে গচ্ছে সারস্বতীয়কে ॥ ২
> কুন্দকুন্দান্বয়ে শ্রেষ্ঠং উৎপন্নং শ্রীগণাধিপম্ ।
> তমেবাত্র প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং সজ্জনা জনাঃ ॥ ৩

সরস্বতী-মন্ত্র

দেবী সরস্বতীকে লইয়া এক উপনিষদ্ও রচিত হইল। নাম হইল 'সরস্বতীরহস্যোপনিষৎ।' এই উপনিষদ্খানি যে খুব প্রাচীন উপনিষদ্ নয়, এই উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীরপুরবাসিনী সারদাধ্যানই তাহার প্রমাণ। সরস্বতী যখন দেবী, তখন তাঁহার ধ্যান, মন্ত্র চাই। মন্ত্র হইলে আবার ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বীজ প্রভৃতিরও আবশ্যক। এই উপনিষদ্ বেদের দশটি মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সরস্বতীর ঋষি, ছন্দঃ, বীজ প্রভৃতির নির্দেশ করিয়া দিলেন। শ্রীসরস্বতী-দশশ্লোকী মহামন্ত্রের—

ঋষি—আশ্বলায়ন, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, দেবতা—শ্রীবাগীশ্বরী
যদ্বাগিতি বীজম্। দেবীং বাচমিতি শক্তিঃ। প্রণো দেবীতি কীলকম্।

> ১। প্র ণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
> ধীনামবিত্র্যবতু ॥—ঋগ্বেদ ৬.৬১.৪

এই মন্ত্রের ঋষি—ভরদ্বাজ, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—সরস্বতী। (প্রণবেন বীজশক্তিঃ কীলকম্)

> ২। আ নো দিব আ পৃথিব্যা ঋজীষিন্নিদং বর্হিঃ সোমপেয়ায় যাহি ॥
> বহন্তু ত্বা হরয়ো মদ্র্যঞ্চমাংগূষমচ্ছা তবসং মদায় ॥ —ঋগ্বেদ ৭.২৪৩

এই মন্ত্রের ঋষি—অত্রি, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ্, দেবতা—সরস্বতী। (হ্রীমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্)

> ৩। পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
> যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥—ঋগ্বেদ ১.৩.১০

এই মন্ত্রের ঋষি—মধুচ্ছন্দা, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—সরস্বতী। (শ্রীমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্)

৪। চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥—ঋগ্বেদ ১.৩.১১

এই মন্ত্রের ঋষি—মধুচ্ছন্দা, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—সরস্বতী। (হ্রীমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্)

৫। মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি॥—ঋগ্বেদ ১.৩.১২

এই মন্ত্রের ঋষি—মধুচ্ছন্দা, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—সরস্বতী। (সৌরীতি বীজশক্তিঃ কীলকম্)

৬। চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি। —ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৪৫

এই মন্ত্রের ঋষি—উচথ্যপুত্র, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ্, দেবতা—সরস্বতী। (ঐমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্)

৭। দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।
সা নো মন্দ্রেষমূর্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপ সুষ্টুতৈতু॥
—ঋগ্বেদ ৮.১০০.১১

এই মন্ত্রের ঋষি—ভার্গব, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—সরস্বতী। (গৌরিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্)

৮। উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাং।
উতো ত্বস্মৈ তন্বংবি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥
—ঋগ্বেদ ১০.৭১.৪

এই মন্ত্রের ঋষি—বৃহস্পতি, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—সরস্বতী। (শমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্)

৯। অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি॥
—ঋগ্বেদ ২.৪১.১৬

এই মন্ত্রের ঋষি—গৃৎসমদ, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, দেবতা—সরস্বতী। (ঐমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্)

চিত্র—৩৮

ক

খ

কালী

মহাকালী

গ

গৌরী

১০। যদ্বাগ্‌বদন্ত্যবিচেতনানি রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ মন্দ্রা।
চতস্র ঊর্জং দুদুহে পয়াংসি ক্ব স্বিদস্যাঃ পরমং জগাম॥

—ঋগ্বেদ, ৮.১০০.১০

এই মন্ত্রের ঋষি—ভার্গব, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—সরস্বতী। (ক্লীমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্)।

সরস্বতী-তত্ত্ব

জগদ্ব্যাপার বিশ্লেষণে হিন্দু উপনিষদ্-ব্রাহ্মণ-যুগে তত্ত্ববিনিশ্চয়ে ব্যাপৃত হইয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ঋষিগণ দেখিলেন—'প্রজাপতি বৈ ইদমাসীৎ'—পূর্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন ছিলেন একমাত্র ব্রহ্ম বা পুরুষ। 'তস্য বাক্ দ্বিতীয়া আসীৎ'—আবার ব্রহ্মের সহিত ছিলেন বাক্। বাক্ যিনি তাঁহারই মধ্যে অনুস্যূত ছিলেন, তিনি তদীয় শক্তিরূপে প্রকটিত হইয়া দ্বিতীয়া হইলেন। পুরুষ প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন "একোহং বহু স্যাম্" [শতপথ-ব্রা, ৬.১.১.৪] এই পৌরুষ কাম বা ইচ্ছাই সৃষ্টির মূল কারণ। অথর্ববেদ (৯.২) তাই কামকে দেবের মধ্যে 'জ্যেষ্ঠ' বলিয়াছেন, তাঁহার দুহিতা হইলেন—ধেনু* যাঁহাকে জ্ঞানিগণ 'বাগ্-বিরাট,' অর্থাৎ জগদ্রূপিণী বাক্ বলিয়া থাকেন। অমনি "সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যত।" বাক্ তো তাঁহারই, তিনি তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইলেন,—"বাগেবাস্য সা সৃজ্যত।" বাক্ সৃষ্ট হইয়া প্রজাপতির "মনঃসঙ্গ" লাভ করিলেন (শতপথ-ব্রা, ১০.৬.৫ ৪)—'তাং মিথুনং সমভবৎ' এবং "গর্ভী অভবৎ" (শতপথ-ব্রা, ৬.১-২) 'সা গর্ভমাধত্ত।' এইবার তিনি তাঁহা হইতে অপক্রমণ করিলেন। প্রজা সৃষ্ট হইয়া পড়িল ;—'সা অস্মাদ্ অপক্রামৎ সা ইমা প্রজাঃ অসৃজ্যত।' তারপর আবার তিনি পুরুষে পুনঃপ্রবেশ করিলেন—'সা প্রজাপতিমেব পুনঃ প্রাবিষৎ।'

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে (২০. ১৪. ২) এই একই কথা বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ (১. ২. ৫) ব্যাপারটি আরও পরিস্ফুট করিয়া বলেন, সেই বাক্ ও সেই আত্মা দ্বারা এই সমস্ত সৃষ্ট হইল—ঋক্, যজুঃ, সাম, ছন্দঃ, যজ্ঞ, প্রজা, পশু সমস্ত সৃষ্ট হইল—'স তয়া বাচা তেন আত্মনা ইদং সর্বম্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চর্চো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন।' এই জগৎ একদিকে যেমন শব্দপ্রভব, অপরদিকে তেমনি বাঙ্ময়।

এই বাক্ই সরস্বতী—বাক্ ও সরস্বতী অভিন্না। শাস্ত্রও উপদেশ করিয়াছেন—

---

* 'সা তে কামদুহিতা ধেনুরুচ্যতে যামাহুর্বাচং কবয়ো বিরজম্।' —অথর্ববেদ, ৯,২.৫

'বাগ্বৈ সরস্বতী'*। শতপথ-ব্রাহ্মণ (৫. ২. ২. ১৩) এই জন্য সরস্বতীকে "সরস্বতী বাক্" নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

জগৎ কেমন করিয়া হইল এবং ইহার সৃষ্টিপ্রক্রিয়াই বা কিরূপ এই সমস্ত তত্ত্ব খুঁজিয়া খুঁজিয়া বুঝিতে গিয়া হিন্দু আর এক দিক্ দিয়া দেবদেবী তত্ত্ব আনিয়া ফেলিলেন। এইরূপ ভাব লইয়া যাঁহারা দেব হইলেন তাঁহারা কর্মবিধির নিয়ন্তা হইলেন, আর যাঁহাদিগকে দেবী বলিয়া গণনা করা হইল, তাঁহারা হইলেন ইঁহাদের অচ্ছেদ্য শক্তি বা শক্তিধাতু। এইরূপে ব্রহ্মা সৃষ্টির অধীশ্বর হইলেন, এবং তাঁহার অচ্ছেদ্য শক্তি সরস্বতী তাঁহার মুখে বসতি করিলেন। তিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তিনিই আবার সৃষ্টির আদিকারণ বাক্ বা শব্দব্রহ্ম (logos)। অপর দিক্ দিয়া দেখিলে তিনিই হইয়া দাঁড়ান—'বাগ্ বৈ ব্রহ্ম'†।

সৃষ্টির আদিকারণ এই শক্তিকে পুরাণ আর এক চক্ষুতে দেখিলেন। সেই অব্যক্ত শক্তিকে পুরাণ 'গুপ্তরূপিদেবী' বলিয়া ধারণা করিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ দেখিলেন, এই 'গুপ্তরূপিদেবী' লক্ষ্মী, মহাকালী ও সরস্বতী ত্রিবিধরূপে বিরাজিতা। লক্ষ্মী যিনি তিনি প্রকৃতির রাজসগুণাত্মিকা, মহাকালী তামসগুণাত্মিকা এবং সরস্বতী সত্ত্বগুণাত্মিকা। চন্দ্রসমপ্রভ এই সত্ত্বমূর্তি অক্ষমালা, অঙ্কুশ, বীণা ও পুস্তকধারিণী। মহালক্ষ্মী ইঁহার জনয়িত্রী।

আর ইঁহার এই মূর্তি মহাবিদ্যা, মহাকালী, ভারতী, বাক্, সরস্বতী, আর্যা, ব্রাহ্মী, কামধেনু, বেদগর্ভা, ধী ও ঈশ্বরী নামে পরিচিত। ইনি বিশ্বমাতা। মহালক্ষ্মী দ্বারা আদিষ্ট হইয়াই ব্রহ্মা সরস্বতীকে শক্তি-স্বরূপে গ্রহণ করেন। ইঁহাদের সৃষ্টিব্যাপারও বিচিত্র। সত্ত্বগুণাত্মিকা সরস্বতী আবার গৌরী ও বিষ্ণুকে উৎপন্ন করিলেন। এদিকে লক্ষ্মী আবার লক্ষ্মী ও হিরণ্যগর্ভের জনয়িত্রী হইলেন। মহাকালী হইলেন সরস্বতী ও রুদ্রের জননী। রাজসগুণাত্মিকা লক্ষ্মীজাত লক্ষ্মী হইলেন সরস্বতীজ বিষ্ণুর শক্তি। আর লক্ষ্মীজাত হিরণ্যগর্ভ মহালক্ষ্মীর আদেশে সরস্বতীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিলেন। ব্যাপারটি প্রকারান্তরেও বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মা আপনাকে স্ত্রীমূর্তিতে—মহালক্ষ্মীরূপে প্রকটিত করিলেন। মহালক্ষ্মীতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ অন্তর্নিহিত। যখন তিনি তমো-দ্বারা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি নিজেকে মহাকালী বা মহামায়ারূপে প্রকটিত করিলেন। সত্ত্বের সংযোগে তিনি আবার আর এক মূর্তিতে প্রকটিত হইলেন—তাহা হইল সরস্বতী। মহালক্ষ্মীর আদেশে প্রত্যেকে এক একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী প্রসব করিলেন। এই জটিল ব্যাপারটি সহজে বুঝাইবার জন্য

---

* কৌ, ৫।২।১২।৮, ১৪।৪ ; তা, ৬।৭।৭ ; ৫।১৬ ; শং, ২।৫।৪।৬ ; ৩।৯।১।৭ ; তৈ, ১।৩।৪।৫ ; ৩।৮।১১।২ ; গো. উ, ১।২০। 'বাগ্বৈ সরস্বতী' গো. উ, ২।২৪।৬।৭, 'বাগ্ধি সরস্বতী', ঐ, ৩।২, 'বাক্ তু সরস্বতী', ঐ, ৩।১।

† বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ—৪.১.২

চিত্র—৩৯

ক

গান্ধারী

খ

সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা

গ

মানবী

নিম্নে একটি সম্বন্ধ-পরিচায়ক লতা (diagram) প্রদত্ত হইল ঃ—
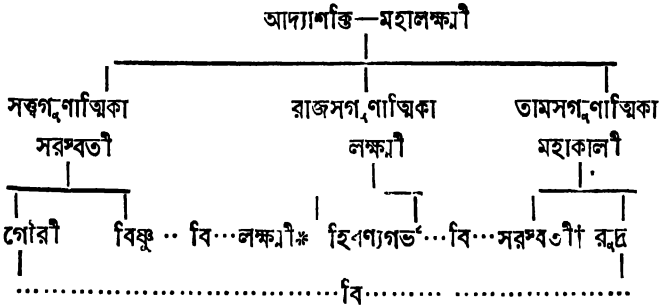
শাস্ত্র দ্বিজগণের ত্রিসন্ধ্যার বিধি করিয়াছেন। ত্রিসন্ধ্যা—প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা। ইঁহাদের প্রাতঃসন্ধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী গায়ত্রী—ঋগ্বেদরূপা; মধ্যাহ্নসন্ধ্যার অধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী—যজুর্বেদরূপা এবং সায়ংসন্ধ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী—সামবেদরূপা। এই ত্রিদেবী আবার অগ্নিরূপিণী। গার্হপত্য, দাক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয়-ভেদে অগ্নিও ত্রিরূপ। সুতরাং গায়ত্রী গার্হপত্যরূপা, সাবিত্রী দক্ষিণাগ্নি-রূপা এবং সরস্বতী আহবনীয়রূপা। গায়ত্রী অগ্নির (ব্রহ্মার) প্রকৃতি বলিয়া তাঁহার ৪ বা ১০ হাত, ৪ মুখ। তাঁহার বাহন হংস। সাবিত্রী রুদ্র-প্রকৃতি, তাঁহার ৪ হাত, ৪ মুখ, ১২ চক্ষু, তাঁহার বাহন বৃষ। সরস্বতী বিষ্ণুপ্রকৃতি অনুসারিণী বলিয়া গরুড়বাহনা, চতুর্হস্তা, একবক্ত্রা। তাঁহার হস্তে বৈষ্ণব-প্রহরণ—চক্র, শঙ্খ, গদা ও অভয়মুদ্রা।

সরস্বতীর জন্ম সম্বন্ধে নানা পুরাণের নানা মত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলিলেন, সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণ মুখোদ্ভূতা। নারদীয় পুরাণ, ধর্ম ও কূর্ম পুরাণ মতে তিনি শিবের কন্যা। দেবীপুরাণ স্থির করিলেন, সরস্বতী শিবের কন্যা, আবার শিবের শক্তি। বরাহপুরাণের সিদ্ধান্তে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সম্মিলিত দৃষ্টি হইতে জন্মিলেন—ব্রাহ্মীকলা = সৃষ্টি = সর্বাসারা, বাগীশা, বিদ্যেশ্বরী, সরস্বতী। তন্ত্রগুলির মধ্যে বৃহন্নীল, কুলার্ণব ও সারদাতিলক মতে সরস্বতী শিবদুর্গার কন্যা। আবার পুরাণাদি শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই, সরস্বতী কখন হইতেছেন ব্রহ্মাণী, কখন ব্রহ্মার কন্যা, কখন তিনি বিষ্ণু-শক্তি, কখন বা শিব-শক্তি। এত গোলমাল কেন? ইহার কারণ নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে বেদনিহিত একটি তত্ত্ব হইতে বৈদিকসাহিত্যের তত্ত্বজ্ঞগণ এই আপাতবিরুদ্ধ ভাবের সমাধান করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—

"চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।

---

* মতান্তরে শ্রী বা সাবিত্রী। † মতান্তরে ঊ বা মহাবিদ্যা বা কামধেনু।

গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।—১.১৬৪.৪৫

বাক্ চারি প্রকার, মনীষী ব্রাহ্মণগণ তাহা জানেন। ইহাদের মধ্যে তিনটি গুহামধ্যে নিহিত, প্রকটিত হয় না। তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ বাক্ মনুষ্যেরা বলিয়া থাকে।

অথর্ববেদ (৯.১০.১৭) ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। শতপথ-ব্রাহ্মণ (৪.১.৩.১৭), তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ (২.৮.৮.৫) প্রভৃতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

চৈতন্যের চারি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় (চতুর্থ অবস্থা)। যে অবস্থায় আত্মার ইন্দ্রিয়-সাহায্যে উপভোগ হয়, তাহাই জাগ্রৎ—

"যৈরিন্দ্রিয়ৈর্যতাত্মা ভুঙ্‌ক্তে ভোগান্ স জাগরো ভবতি"

জাগ্রৎ অবস্থায় যে বাক্ তাহার নাম বৈখরী। এই বাক্ আমরা বলিয়া থাকি। বক্ত্রে ইহার আবির্ভাব এবং বক্ত্রেই ইহার স্ফূর্তি। বক্ত্রের অধিপতি ব্রহ্মা। সুতরাং বৈখরী বাক্ ব্রহ্মার কন্যা। এই বাক্ই যখন ব্রহ্মশক্তি তখন তিনি ব্রহ্মপত্নী।

আর—"সংজ্ঞারহিতৈরপি তৈরস্যানুভবো ভবেৎ পুনঃ স্বপ্নঃ"

স্বপ্নাবস্থায় অনুভব ইন্দ্রিয় সাহায্যেই হয়, কিন্তু তখন সংজ্ঞা থাকে না। স্বপ্নাবস্থায় যে বাক্ তাহা মধ্যমা। প্রাণ হইতে ইহার উৎপত্তি। প্রাণের অধিপতি বিষ্ণু সুতরাং এই হিসাবে মধ্যমা বাক্ বিষ্ণুশক্তি।

'আত্মনিরুদ্যমতয়া নৈরাকুল্যং ভবেৎ সুষুপ্তিরপি।'—আত্মার কোন চেষ্টা নাই, আকুলতা নাই—একেবারে শান্ত। ইহারই নাম সুষুপ্তি। এইরূপে হৃদয় হইতে সুষুপ্তি অবস্থায় যে বাক্ তাহা 'পশ্যন্তী'। হৃদয়ে ইহার স্ফূর্তি। রুদ্র হৃদয়ের অধিপতি। কাজেই পশ্যন্তী বাক্ রুদ্রশক্তি।

ইহার পর যে অবস্থা তাহাতে 'চেতঃ' হইতে সমস্ত 'ঘন'—আবিলতা সরিয়া গিয়াছে ;—তাহাতে তখন আত্মা তমঃশূন্য চেতসে তুরীয় ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। 'পশ্যতি পরং যতাত্মা নিস্তমসা চেতসা তুরীয়ং তৎ।' তুরীয় অবস্থায় যে বাক্ তাহা 'পরা'। এই বাক্ নাদাত্মিকা। মূলাধার হইতে ইহা উদিত হইয়া আত্মায় এই পরার বিকাশ হয়।

সরস্বতী-ব্রহ্মপত্নী

সরস্বতীর সহিত ব্রহ্মার এ সম্বন্ধ কেমন করিয়া হইল ? ঋগ্বেদ আলোচনা করিলে ইহার একটা মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ (১.১৬৪.৩৫) একস্থানে বলিয়াছেন —"এই বেদিই পৃথিবীর শেষ অন্ত, এই যজ্ঞই ভুতজগতের নাভিভুত, এই সোমই সেচনশীল অশ্বের রেতঃ, এবং এই ব্রহ্মা (ঋত্বিক্) বাক্যের পরম স্থান।"

"ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।
অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম ॥"

চিত্র—৪১

বৈবাট্যা

অচ্ছুপ্তা

মানসী

মহামানসী

এখানে ব্রহ্মার সঙ্গে 'বাক্'-দেবীর একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। বাক্ই যে সরস্বতী হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। ব্রাহ্মণ-যুগে এই সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর দেখিতে পাই। শতপথ (৩.৯.১.৭) বলিতেছেন—

"বাগ্বৈ সরস্বতী বাচৈব তৎপ্রজাপতিঃ পুনরাত্মানমাপ্যাযযত বাগেনমুপসমাবর্তত বাচমনুকামাত্মনোঽকুরুত বাচোঽএবৈষ এতদাপ্যায়তে বাগেনমুপসমাবর্ততে বাচমনু-কামাত্মনঃ কুরুতে।"

বাক্ই সরস্বতী ; ইহাদ্বারা প্রজাপতি পুনরায় নিজেকে আপ্যায়িত করিলেন ; বাক্ তাঁহার দিকে ফিরিয়া আসিলেন ; তিনি বাক্কে আত্মবশ করিলেন। এক্ষণে তিনি বাক্যদ্বারা আপ্যায়িত হইলেন, বলবান্ হইলেন, বাক্ তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আসিলেন, তিনি তাঁহাকে আত্মবশ করিলেন।

বোধ হয়, এইরূপ করিয়াই আমরা সরস্বতীকে ব্রহ্মার স্ত্রীরূপে পাইয়াছি। ব্রহ্মার একটি অপবাদ আছে যে, তিনি কন্যাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণে এ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে। ইহাতে দেখা যায় যে, সরস্বতী শতরূপা প্রজাপতির মানসকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সরস্বতীর মোহিনী মূর্তি দেখিয়া প্রজাপতি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ; কিন্তু তাঁহার মানসপুত্রগণ তাহাতে বাধা দেন। শেষে তিনি ক্ষোভে দেহত্যাগ করেন।

মৎস্যপুরাণের ব্যাখ্যার দোহাই এইরূপ—ব্রহ্মা বেদ, শতরূপা বা সরস্বতী অপর কেহ নন সাবিত্রী প্রার্থনা। কন্যা-বিবাহ ব্যাপার লইয়া দেবতাদের মধ্যেও ব্রহ্মার বেশ একটু নিন্দাও রটিয়াছিল। তবে মৎস্যপুরাণ কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। সরস্বতী যে ব্রহ্মার পত্নী তাহা শাস্ত্রকাররা এক রকম সাব্যস্ত করিয়াই দিয়াছেন। যে করিয়াই হউক সরস্বতী তো হইলেন ব্রহ্মার পত্নী।

ঋগ্বেদের শেষের দিকে একটা অদ্ভুত কথার অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। কথাটি এই—পিতা যুবতী কন্যাকে সম্ভোগ করিলেন। ইহার ফলে ব্রহ্মার সৃষ্টি এবং ব্রতরক্ষাকারী বাস্তোষ্পতির নির্মাণ হইল। অবশ্য এখানে পিতা ব্রহ্মাও নন এবং কন্যা সরস্বতীও নন। এখানে পিতা রুদ্র ও কন্যা উষা। সায়ণও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তবে একই স্থানে পিতৃকর্তৃক কন্যাসম্ভোগ এবং পরে ব্রহ্মার উল্লেখ থাকায় পরবর্তী কালে বোধ হয় ব্যাপারটি রূপান্তরিত হইয়া ব্রহ্মারই কন্যাগমন সূচিত করিয়া দিয়া থাকিবে।

ভোজরাজ-স্থাপিত সরস্বতী

১৯২৪ সালে 'রূপম্' পত্রে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত একটি সরস্বতীমূর্তি ও তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূর্তিটি চতুর্ভুজা কিন্তু তিনটি হস্তের অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া

গিয়াছে। (চিত্র—পরিশিষ্ট) অপর তিনটি হস্তে সম্ভবত মাল্য, পুস্তক, বীণা কিংবা কমণ্ডলু ছিল বলিতে পারা যায়। একটি হস্তে কর্ত্রী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। মূর্তিটি হইতে ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্যের সৌন্দর্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার দেহের বিভিন্ন অংশের বেশ সামঞ্জস্য আছে। এই মনোরম মূর্তিটির দিকে চাহিলে, ইহাতে যে ভাবের পবিত্রতা আছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই সরস্বতীর অলঙ্কার ও শিরোভূষণের দিকে লক্ষ্য করিলে উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্যের ঐক্য ইহাতে সমাবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সরস্বতীর বাহুর অলঙ্কার-গুলি অতি সুন্দর। এই অলঙ্কারগুলি দেখিয়া মনে হয়, পাল রাজাদের সময়ের মূর্তির সহিত এই মূর্তির গঠনভঙ্গির সাদৃশ্য আছে। উড়িষ্যা দেশের মূর্তির সঙ্গেও ইহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সরস্বতী মূর্তিটি একটি বেদির উপর দণ্ডায়মানা। বেদিতে একটি ক্ষোদিত লিপি আছে। এই লিপিটি শার্দূল-বিক্রীড়ত ছন্দে লেখা। লিপিপাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, ভোজরাজের রাজত্বকালে এই সরস্বতী মূর্তিটি স্থাপিত হইয়াছিল। মূর্তি-স্থাপনের সময় ১০৯১ সংবৎ (=১০৩৫ খ্রীঃ)। এই সময় রাজা ছিলেন মালবের প্রমার-বংশীয় ভোজ। তিনি ১০১৮ হইতে ১০৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বিদ্যালোচনা ও সঙ্গীতে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। প্রবাদ, তিনি একটি সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যাপীঠটি কোন এক মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল। আর সেই মন্দিরটি বাগ্দেবীকে উৎসর্গীকৃত হয়। এই সরস্বতী মূর্তি ভোজরাজের স্থাপিত বিদ্যাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। এই বিদ্যাপীঠটি এখন "ধারা"তে দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদিতে ক্ষোদিত লিপির কিয়দংশ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কে এন দীক্ষিত মহাশয় এই লিপির একটি পাঠ উদ্ধার করেন। তাঁহার পাঠোদ্ধার নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"ওঁ শ্রীমদ্-ভোজ-নরেন্দ্র-চন্দ্র নগরী-বিদ্যাধরীর্মনধিঃ নামা স ম্ম খলু সুখম (প্র প্য ল) যাপ্সরা বাগ্দেবী(মু) প্রতিমা(মু) বিদ্যায় জননী যস্যার্জ্জ (তনম ত্রায়ী)......ফলাধিকামধর (সরিন)

মূর্ত্তিম্ শুভম্ নির্ম্মেতি শুভম্ ॥
সূত্রধরসাহিরসুত মনথলেন ঘটিতম্ ॥
রি···তিক শিবদেবেন লিখিতমিতি সংবৎ ১০৯১ ॥"

দীক্ষিত মহাশয় এই লিপিটির একটি ভাবার্থ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত সারোদ্ধারের বঙ্গানুবাদ এইরূপ,—

ওঁ ভোজনগরীর বিদ্যাধরী রাজাদের চন্দ্রস্বরূপা......প্রথমে বাগ্দেবী···ফলদাত্রী

চিত্র—৭১

যবদ্বীপে বীণাবাদিনী সরস্বতী

...এই পবিত্র প্রতিমা গঠন করিয়াছেন। মূর্তিটি শিল্পী সাহিরের পুত্র মনথল কর্তৃক নির্মিত এবং বেদির ক্ষোদিত লিপি ১০৯১ সংবতে শিবদেব দ্বারা ক্ষোদিত।

উত্তর-ভারতে কয়েকটি মূর্তির বেদিতে স্থপতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপিটি তাহার অন্যতম। দক্ষিণ-ভারতে পল্লব-স্থাপত্যেও কয়েকটি স্থানে স্থপতিদের নাম পাওয়া যায়।

মূর্তিতত্ত্বের দিক্ দিয়া আমরা এই মূর্তির বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট দেখিতে পাই। মূর্তিটি চতুর্ভুজা। একেবারে অভঙ্গ। দেবী সরস্বতীর অঙ্গে যজ্ঞসূত্র আছে। বক্ষে কুচবন্ধ। মস্তকের জটাগুলি শিরোভূষণরূপে শোভা পাইতেছে। কণ্ঠে মুক্তাহার। চারুরূপিণী সৌম্যমুখী এই সরস্বতী দেবীর মুখশ্রী অতি সুন্দর। দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে নীচের দিকে শ্মশ্রুবিশিষ্ট একটি মূর্তি আছে। ইহা সম্ভবতঃ কোন মুনি বা ঋষির মূর্তি। তাঁহার বামদিকে যে সিংহারূঢ়া মূর্তি আছে তাহা বোধ হয় পার্বতীর বা শক্তির। শক্তি বা পার্বতী সরস্বতীর মূর্তি-বিশেষ এবং সেই শক্তির মূর্তি সাত্ত্বিক মূর্তি। ঋষির সম্মুখে ক্ষুদ্র মূর্তিটি যিনি এই সরস্বতী মূর্তিটি দান করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাঁহার।

পুরাতন যুগে হিন্দু-স্থাপত্যের এই আদর্শ সরস্বতী মূর্তিটি শিল্পের দিক্ দিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহাতে সকল বৈশিষ্ট্যই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।*

বীণাবাদিনী বৌদ্ধ-সরস্বতী

হিন্দু স্থাপত্যে বীণাবাদিনী সরস্বতীর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বৌদ্ধদের মূর্তি যে সমস্ত স্থানে পাওয়া যায় সেই সমস্ত স্থানে কোথাও বীণাহস্তা সরস্বতী দেখিতে পাওয়া যায় না। গান্ধারে একটি বীণাবাদিনী সরস্বতী পাওয়া গিয়াছিল। আমরা পূর্বে সেই মূর্তির বিবরণ দিয়াছি। (চিত্র—৩২ক) গ্রুনভেডেল (Grunwedel) ইহা সরস্বতী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সারনাথে সংরক্ষিত মূর্তির মধ্যে পাথরের একটি ছোট মূর্তি (১৩৪ নং, ১' ২'') আছে। এই মূর্তিটি নিঃসন্দেহে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী। ইনি বীণা বাজাইতেছেন। সারনাথ ব্যতীত বৌদ্ধদের আর কোন স্থানে সরস্বতীর মূর্তি পাওয়া যায় নাই। বর্তমান মূর্তিটির সহিত হিন্দুদের সরস্বতীর কোন পার্থক্য নাই (Report, A. S. I., 1904-05, p. ৪6)। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয় একটি বৌদ্ধ বীণাবাদিনী সরস্বতীমূর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। মূর্তিটি পালযুগের। মূর্তিটিতে চৈত্য-নিদর্শন ইহার বৌদ্ধত্ব সূচিত করিয়া দিতেছে (চিত্র—৩২খ)।

রুষ প্রদেশে লেনিনগ্রাড চিত্রশালায় (Leningrad Museum) উখ্‌তোমৃস্কি-সংগ্রহে (Ukhtomskij Collection) একটি অতি সুন্দর মনোরম সরস্বতী মূর্তি

* Rupam, 1924

আছে। সরস্বতী বীণাবাদন করিতেছেন। (চিত্র—৪) মূর্তি দ্বিদলপদ্মের আসনোপরি আসীনা। ঐ সরস্বতী দেবীর ভঙ্গি অতি চমৎকার। এই মূর্তিটি নেপাল পদ্ধতি অনুসারে নির্মিত। এই মূর্তির অন্য পরিচয় অনাবশ্যক। নেপাল পদ্ধতিতে যেরূপ বস্ত্রালঙ্কার থাকে ইহাতে সেইরূপ আছে।

যবদ্বীপে সরস্বতী

যবদ্বীপে পদ্মোপরি আসীনা সপ্ততন্ত্রী বীণাহস্তা একটি ধাতুনির্মিত সরস্বতী মূর্তি সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।* এই মূর্তির বীণার বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ সপ্ততন্ত্রী বীণার পরিচয়ও আছে। মূর্তিটির শিরোভূষণ দেখিবার মত জিনিস। (চিত্র—৪২)

যবদ্বীপে দ্বিদল-পদ্মোপবিষ্টা বীণাবাদিনী সরস্বতী-মূর্তিও আছে। ৪১ সংখ্যক চিত্রে দেখা যাইবে, দেবী যজ্ঞোপবীত-ধারিণী। ইঁহার উষ্ণীষে যথেষ্ট শিল্প-চাতুর্য রহিয়াছে।

তিব্বতে সরস্বতী

তিব্বতে যতগুলি সরস্বতী দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে দণ্ডায়মানা মূর্তি নাই বলিলেও চলে। সাধারণতঃ দ্বিভুজা আসীনা মূর্তি বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বতী এখানে হস্তে বীণাধারিণী। কখনও কখনও তাঁহার হাতে বজ্রও দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তাঁহার নাম হয় বজ্রসরস্বতী। সরস্বতীর রঙ্ শাদা। তিনি সাধারণতঃ ময়ূরবাহনা। তিব্বতে পদ্মোপরি উপবিষ্টা সরস্বতী মূর্তিও যথেষ্ট আছে। (চিত্র নং—৫, ৪৩)

তিব্বতীরা সরস্বতীকে "যঙ্-চন্-ম" (Dbyangs-can-ma)† বলিয়া থাকে। "যঙ্ শব্দে "সরস্" বুঝায় ; এই 'সরস্'-এর অর্থ সুমিষ্ট স্বর— জল নয়। চন্= অস্ত্যর্থদ্যোতক 'বৎ' ; ম=স্ত্রীত্ববাচক='ী'।

জাপানী সরস্বতী

প্রাচীনকালে ভারতীয় পণ্ডিতগণ জাপানের সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জাপানীগণের ধর্মজীবন-গঠনের সহায়ক অনেক জিনিসও ভারত হইতে জাপানে নীত হইয়াছিল। কয়েকটি হিন্দু-দেবতাদেরও জাপানীগণ আত্মসাৎ করিতে ছাড়েন নাই। জাপানে সাতটি সৌভাগ্যদেবতা আছেন। ইঁহাদের মধ্যে

---

* Dwaja, June 1927, No. 3

† তিব্বতে এই দেবীকে যঙ্-গি-লহ-ম (Ngaggi-lha-ma) নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই শব্দের অর্থ বাগ্দেবী।

চিত্র—৪২

যবদ্বীপে সপ্ততন্ত্রী-বীণাবাদিনী সরস্বতী

তিনটি দেবতা ভারত হইতে গৃহীত। প্রথম দেবতার নাম দই-কোকু-তেন (Daikokuten) বা মহাকাল। ভারতীয় দ্বিতীয় দেবতার নাম 'বেন-জই-তেন' অর্থাৎ সরস্বতী। তৃতীয় দেবতা 'বিষমনতেন' অর্থাৎ বৈশ্রবণ বা কুবের। ইঁহার অপর নাম 'তমোন্‌তেন'।*
জাপানে সরস্বতী-মন্দির আছে। বেন্‌-তেন এই মন্দিরগুলিতে পূজিত হইয়া থাকেন। মন্দিরগুলি পুষ্করিণী, নদী বা সমুদ্রের নিকট নির্মিত হইয়া থাকে। জলের ধারে ছাড়া আর কোথাও বেন্‌-তেনের মন্দির তৈরি হইতে পারে না। জাপানের একটি প্রসিদ্ধ সরস্বতী-মন্দির তোকিওর অন্তর্বর্তী উয়েনো (Uyeno) নামক স্থানে শিনোবাজু পুষ্করিণীর (Shinobazu) নিকটে অবস্থিত। কামাকুরার নিকটবর্তী এনোশিমা (Yenoshima), চিকু-বুশিমা (Chikubushima) ও মিয়জিমা (Miyajima [Itsukushima]) এই তিনটি দ্বীপেও বেন্‌-তেন বিশেষভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত মন্দিরে বেন্‌-তেনের মূর্তি স্থাপিত। বীণাহস্তা ভারতীয় অপ্সরার মূর্তিতে বেন্‌-তেনকে কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তকযুক্ত dragon-এর উপরই এই মূর্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর বেশ-বিন্যাসের শোভা অতি চমৎকার। হস্তে বীণা। সম্মুখে নৃত্যশীল উপাসক। দেবী dragon-এর উপর দণ্ডায়মানা। ভঙ্গী বেশ সুন্দর। Dragon-এর মুখ নরাকৃতি, তবে পুচ্ছ আছে। চক্ষু রত্নখচিত, দেহের স্থানে স্থানেও রত্ন। অপর মূর্তিটি ধাতুময়ী—dragonএ আসীনা। মূর্তির প্রশান্ত ভাব অতিশয় মনোমদ। (চিত্র—৪৪)

জাপানে দেখা যায়, দেবী বেন্‌-তেন dragon বা প্রকাণ্ড সর্পের উপর বসিয়া বা দাঁড়াইয়া আছেন। সাধারণতঃ বেন্‌-তেন দেবীর দুই হাত, দুই হাতে তিনি বীণা ধারণ করিয়া থাকেন। বীণাকে জাপানীরা 'বিউয়া' (biwa) বলে। অষ্টভুজা বেন্‌-তেন-মূর্তিও আছে। হস্তে তখন বজ্র, অসি, চক্র, পাশ, পরশু, ধনু ও শর থাকে। এইরূপ মূর্তির নাম—হপ্পি বেন্‌-তেন (Happi Benten), কোঙ্গো সিও বেন্‌-জাই-তেন। দই-বেন্‌ জাই-তেনের হাতে শুধু অসি ও 'তম' থাকে।

জাপানী মহাজন ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা সাতটি সৌভাগ্যদেবীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সৌভাগ্যদেবীর জাপানী নাম 'সিচি-ফুকু-জিন' (Shichi-Fuku-Jin)। পূর্বে এই দেবীগণকে জাপানীরা পূজা করিত। আজকাল এই সব দেবীর বেশ বাহারে মূর্তি দিয়া ইঁহারা বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া থাকেন। এই সপ্ত দেবতার নাম—বেন্‌-তেন, ফুকুরোকুজু, বিষমন, জিরোজিন, হোতে, এবিসু, দাইকোকু। ইঁহাদের মধ্যে সকলেই পুরুষ দেবতা। কেবল বেন্‌-তেনই স্ত্রী-দেবতা। আর ইনিই হইলেন সরস্বতী। বেন্‌-তেনের পুরা নাম—'দই-বেন্‌-জাই-তেন' (Dai-ben-zai-

* Young East, 1925, vol 1. No. 5—'What Japan owes to India', pp. 144-145

ten) অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির মহাদেবী। ইনি নদী, বাগ্মিতা ও ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইঁহার প্রসাদে শক্তি, সুখ, ধন, দীর্ঘায়ু, যশ ও ধীষণা লাভ হইয়া থাকে। এই দেবী 'বেন্-জাই-তেন,' বেন্-তেন্-সম' অথবা কেবল 'বেন্-তেন' নামে পরিচিত। বেন্-তেনের সঙ্গে একটি dragon এবং 'হুকুজা' অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের সর্প থাকে। কখন কখন হুকুজাকে শিরোভূষণ ও শ্বেত ভ্রূযুক্ত একটি বৃদ্ধের মূর্তি করিয়া দেখান হয়।

ভারতীয় বৌদ্ধদের একটি দেবতা আছে, নাম—'আর্যজাঙ্গুলি'। ইনি শ্বেততারার মূর্তি-বিশেষ। এই দেবী চতুর্ভুজা ; ইঁহার দুই হস্তে বীণা। ইঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, দেবীর সঙ্গে একটি শ্বেতবর্ণের সর্প থাকিবেই। জাপানীরাও শ্বেতসর্পকে সরস্বতী-দেবীর প্রকটমূর্তি (manifestation) বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। অ্যালিস গেটি (Alice Getty) বলেন, জাপানীরা আর্যজাঙ্গুলি ও সরস্বতীকে গুলাইয়া ফেলিয়া এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়াছে।

জাপানীরা বেন্-তেনকে প্রেমের দেবী (goddess of love) বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। বেন্-তেন সম্বন্ধে জাপানীদের মধ্যে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে। কাহিনীটি এইরূপ—এক সময়ে একটি গুহায় এক প্রকাণ্ড dragon বাস করিত। গুহার চারিপাশে লোকের বাস ছিল। Dragonটি ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া খাইত। একদিন ভয়ংকর ভূমিকম্প হইল এবং বেন্-তেন দেবী মেঘে দেখা দিলেন। এদিকে জল হইতে হঠাৎ একটি দ্বীপ বাহির হইয়া পড়িল। দ্বীপটির নাম এনোশিমা। বেন্-তেন দেবী দ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন এবং dragonকে বিবাহ করিলেন। তখন হইতে সমগ্র উপদ্রবের শান্তি হয়। বেন্-তেনের পনরটি ছেলে, নাম—অইকিও (Aikio), হঙ্কি (Hanki), হিক্কেন, (Hikken), গুইবা (Guiba), ইন্য়াকু (Inyaku), জুশা (Jusha), কেইশো (Keisho), কোন্সই (Konsai), ক্বোন্তই (Kwantai), সন্য়ো (Sanyo), সেন্শা (Sensha), শুসেন (Shusen), শোমো (Shomo), তোচিউ (Tochiu), এবং জেন্সই (Zensai)। বেন্-তেনের আরও দুইটি নাম আছে—একটি 'কোতোকুতেন' (Koto kuten) [Kung Te] বা সুকৃত-দেবী, আর একটি অকো 'মিও-ওন-তেন' বা 'বি-ওন-তেন' অর্থাৎ আশ্চর্যবাগীশ্বরী ভারতী। কোবোদইশি (Kebodaishi) 'শিঙ্গন' সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। ইহার পূর্বে জাপানীরা ইসুকুশিমার (Itsukushima) পূজা করিত। কিন্তু এই সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইবার পর হইতে দই-বেন্-জাই-তেনেরই পূজা করিতে লাগিল। ইসুকুশিমার পূজা লোপ পাইল।

জাপানে বেন্-তেন সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একটি গল্পের উল্লেখ এখানে করিতেছি। বুন্শো (Bunsho) শিমিয়োসু দইমিওজিনের (Shimmiyosu Daim ojin) কন্যা। বুনশোর ছেলে হয় না। বেন্-তেনের কাছে তিনি পুত্রকামনায় মানত করিলেন। ফলে তাঁর গর্ভসঞ্চার হইল। বুন্শো যথাকালে পাঁচশত ডিম্ব

চিত্র—৪৩

তিব্বতে সরস্বতী

প্রসব করিলেন। তাঁর ভয় হইল, যদি ডিম্ব হইতে দানবের উদ্ভব হয় তাহা হইলে তো বিপদ্। ডিম্বগুলি একটি ঝুড়িতে পুরিয়া নিকবর্তী রিনজু-গাওয়া (Rinzugawa) নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। এক জেলে তাহা ধরিল এবং ডিম্বগুলি উত্তপ্ত বালুকায় রাখিয়া ফুটাইল। কিছুদিন পরে দেখে একপাল ছেলে। তার আশ্চর্যের সীমা রহিল না। গরীব জেলে তাহাদের ভরণ কি করিয়া করিবে। সে গ্রামের মণ্ডলকে গিয়া সমস্ত বলিল। মণ্ডলের উপদেশে সে দয়াবতী বুনশোর নিকটে ছেলেগুলিকে রাখিয়া আসিল। ঘটনা শুনিয়া বুনশোর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাহাদের লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিলেন। বেনু-তেনের কৃপা হইলে এইরূপই হয়। শেষে বুনশোও দেবতাগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।*

সরস্বতী-মন্দির

বাৎস্যায়নের কামসূত্র পড়িয়া জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে পক্ষান্ত বা মাসান্ত দিনে তখনকার প্রথানুসারে সরস্বতী-মন্দিরের পূজারীরা সমাজের ব্যবস্থা করিতেন। সমাজ বলিলে নাট্যাভিনয় বুঝাইত। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (Chowkhumba Sanskrit Series, পৃ. ৪৯-৫১) নাট্যাভিনয় অর্থে সমাজের উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ন ইহাকে ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূজারীরা তো সমাজের ব্যবস্থা করিতেন। অন্যান্য স্থান হইতেও অভিনেতারা আসিয়া সরস্বতী-মন্দিরের সম্মুখে অভিনয় করিত। এই অভিনয়ের নাম ছিল "প্রেক্ষণম্।" অভিনয়ের পরদিন মন্দির-সেবকেরা অভিনেতাদের অভিনন্দিত করিতেন। তারপর দরকার হইলে পুনরায় অভিনয় হইত। দর্শকদের ইচ্ছানুসারে অভিনয় বন্ধ করিয়াও দেওয়া হইত। এই অভিনয়ের সঙ্গে ধর্মের বিশেষ সম্বন্ধ ; কেন না, নাটক ও নাট্যশালার অধিষ্ঠাত্রী বাগীশ্বরী সরস্বতীর মন্দিরেই এই অভিনয় হইত। বোধগয়া ও নালন্দায় সরস্বতী-মন্দির ছিল। বারাণসীতে মানসকালী বা কালরাত্রি ঠাকুরবাড়ি আছে। এটি ময়ূরবাহনা সরস্বতীর মন্দির। এই দুই স্থানের এই মন্দিরকে বাগীশ্বরী-মন্দির বলিত। এক্ষণে মহিয়রে সরস্বতী-মন্দির আছে। মহিয়র এলাহাবাদ ও জব্বলপুর রেলের একটি স্টেশন। এখানকার সরস্বতী-মন্দির খুব প্রসিদ্ধ। স্থানীয় লোকেরা দেবীকে "সারদা দেবী" বলে। মন্দিরটি পুরানো। বুন্দেলখণ্ডে চণ্ডেলদের সময়ের কি না বলা যায় না।

সম্প্রতি আসামে একটি সুন্দর সরস্বতী-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ মূর্তিটি সরস্বতী-মন্দিরে ছিল বলিয়া প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগেও সরস্বতী-মন্দির ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। হাওড়া পঞ্চানন-তলায় একটি সরস্বতী-মন্দির কয়েক বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছে (৪৭ সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য)।

---

* ইতালীর পণ্ডিত পুইনি (Puini) কর্তৃক বিবৃত। তাঁহার Il Sette genii della felicita দ্রষ্টব্য।

শিল্পরত্ন (৯ম অধ্যায়, শ্লোক ৫) নির্দেশ করিয়াছে যে, গ্রামের মধ্যে অগ্নিকোণে লক্ষ্মী, শর্বাণী কালী ও ভারতী-মন্দির করিবে।

পরমার-বংশীয় রাজাদের সময় উজ্জয়িনী, ধারা, মাণ্ডু (মণ্ডপদুর্গ) ও মালব-প্রদেশের অন্তর্গত নাল্‌ছ গ্রাম (নল্‌কদিছপুর) সরস্বতীর পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ সমস্ত স্থানে সরস্বতী-মন্দিরও ছিল। কথাসরিৎসাগরের (৬৬ অধ্যায়) একটি কথায় সরস্বতী-মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে আছে, কাশ্মীরে সিংহাক্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পত্নী—মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ, পুরোহিত ও চিকিৎসকের পত্নীগণের সহিত শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে সরস্বতী-মন্দিরে তীর্থযাত্রা করেন। সরস্বতী সেই নগরের রক্ষয়িত্রী।

মন্দিরে সরস্বতীর স্থান

ত্রিপুরান্তক নামে একজন লকুলীশ বা নকুলীশ পাশুপত ১২৮৭ খ্রীস্টাব্দে সোরঠের (কাঠিয়াবাড়) অন্তর্বর্তী শৈবতীর্থ সোমনাথপত্তনে (অথবা দেবপত্তন বা প্রভাসে) পাঁচটি শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই পাঁচটি মন্দিরের অন্তরালে তিনি পাঁচটি শ্রীমূর্তি স্থাপিত করেন। এই পাঁচটি মূর্তি গোরক্ষক (গোরখনাথ), ভৈরব, আঞ্জনেয় (হনুমান্‌), সরস্বতী ও সিদ্ধিবিনায়কের (গণেশের)।

"গোরক্ষকং ভৈরবমাঞ্জনেয়ং সরস্বতীং সিদ্ধিবিনায়কং চ।*
চকার পঞ্চায়তনান্তরালে বালেন্দুমৌলিস্থিতমানসো যঃ॥" ৪৫

গায়ত্রী-সাবিত্রী-সরস্বতী

অগ্নিপুরাণ† বলেন, গায়মান গুরুরূপে শিষ্য ভার্যা ও প্রাণকে ত্রাণ করেন বলিয়া দেবীর নাম গায়ত্রী; তিনি সবিতাকে প্রকাশ করেন বলিয়া তাঁহার নাম সাবিত্রী; আর বাগ্‌রূপা বলিয়া তাঁহার অন্য নাম সরস্বতী। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেন, "গায়ত্রী নাম পূর্বাহ্নে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে। সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিষু স্মৃতা॥ প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ। গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্‌ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ॥ ব্যাসঃ॥ সবিতৃদ্যোতনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীর্তিতা। জগতঃ প্রসবিত্রীত্বাৎ বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী॥" তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। আহ্নিককৃত্যতত্ত্ব ৪২।

---

* Epigraphia Indica, vol. I. p. 284

† গায়ন্তিষ্যান্‌ যতস্ত্রায়েদ্ভার্যাং প্রাণাংস্তথৈব চ। ১
ততঃ স্মৃতেয়ং গায়ত্রী সাবিত্রীয়ং ততো যতঃ।
প্রকাশনাৎ সা সবিতুর্বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী। ২
—২১৬ অধ্যায়

চিত্র—৪৪

জাপানে সরস্বতী (বেন-তেন)

"গায়ত্রী ব্রহ্মরূপা চ সাবিত্রী বিষ্ণুরূপিণী। সরস্বতী রুদ্ররূপা উপাস্যা রূপভেদতঃ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। পূর্বসন্ধ্যা তু গায়ত্রী সাবিত্রী মধ্যমা স্মৃতা। যা ভবেৎ পশ্চিমা সন্ধ্যা বিজ্ঞেয়া সা সরস্বতী।"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। আহ্নিককৃত্যতত্ত্ব ১৭।

"সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং। সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদ-সমাযুতাম্।"—ঐ, ৪৭।

বাগীশ্বরী-যন্ত্র

(চিত্র—৪৮)

তন্ত্রসারে বাগীশ্বরী যন্ত্রের অঙ্কন-পদ্ধতি আছে। তদনুসারে 'হ্সৌঃ', (= হ্, স, ঔ, ঃ) এই চারিটি বর্ণ প্রথমে কর্ণিকার মধ্যে আঁকিতে হইবে। কর্ণিকার বাহিরে একটি বৃত্ত আঁকিতে হইবে। বৃত্তের চারিদিকে আটটি পদ্মপত্র আঁকিয়া দুই-দুইটি স্বর দ্বারা 'কেশর' এবং পত্র মধ্যে আটটি বর্গ (শ্বাসবর্গের পঞ্চবর্গ ও 'য' 'শ' লার্ণাদিত্রিবর্গ) অঙ্কন করিতে হইবে। এই গুলির বাহিরে চতুষ্কোণ ও চতুর্দ্বার লিখিতে হইবে; চতুর্দ্বারে 'বং' এবং চতুষ্কোণে 'ঠং' লিখিতে হইবে। এইরূপ যন্ত্রের নাম 'বাগীশ্বরীযন্ত্র'।

বাগীশ্বরীযন্ত্র পূজার ক্রমও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসান্ত কর্ম শেষ করিতে হইবে। তারপর কেশরে, মধ্যে এবং চতুর্দিকে "ওঁ মেধায়ৈ নমঃ" উচ্চারণ করিয়া মেধা-দেবতার ন্যাস করিবে। তারপর এইরূপে 'ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ', 'ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ', 'ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ', 'ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ', 'ওঁ স্মৃত্যৈ নমঃ', 'ওঁ বুদ্ধ্যৈ নমঃ'; 'ওঁ বিদ্যেশ্বর্যৈ নমঃ', বলিয়া দেবতাদের ন্যাস করিতে হইবে। তারপর বলিতে হইবে 'নমঃ সর্বত্র'। অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস ও মন্ত্রন্যাস। ঋষ্যাদিন্যাস এইরূপ—

'শিরসি কন্বঋষয়ে নমঃ। মায়াপুটিতশ্চেৎ বৃহস্পতিঋষয়ে নমঃ। মুখে বিরাট্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি বাগীশ্বর্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।' মন্ত্রন্যাসে বলিতে হয়—'শিরসি বং নমঃ। শ্রবণয়োঃ দং নমঃ বং নমঃ। চক্ষুষোঃ দং নমঃ বাং নমঃ। নাসিকয়োঃ গবাং নমঃ দিং নমঃ। বদনে নিং নমঃ। লিঙ্গে স্বাং নমঃ। গুহ্যে হাং নমঃ।' অতঃপর মাতৃকান্যাস* তারপর করাঙ্গন্যাস, তারপর ধ্যানের বিধি।

* "তত্র মাতৃকায়া ঋষ্যাদিন্যাসঃ। অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরা শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।"

"মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ন্যসেৎ পাপনিকৃন্তনীম্।
ঋষিব্রাহ্মাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে।
দেবতা মাতৃকাদেবী বীজং ব্যঞ্জনমুচ্যতে।
শক্তয়স্তু স্বরা দেবি ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ।"—জ্ঞানার্ণব

তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে ধ্যানের বিধি ঃ—

"তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু

বাগ্‌দেবতা নঃ ॥"

এইরূপে দেবীর মূর্তি ধ্যান করিয়া মানসপূজা ও শঙ্খস্থাপন করিতে হয়।

এই প্রকারে পূজার ক্রম ও পদ্ধতি তন্ত্রসারে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। প্রপঞ্চসারের পূজাপদ্ধতিও অবলম্বিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয়ের আলোচনা না করিয়া আমরা এখানে বাগীশ্বরী-যন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিব।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বাগীশ্বরী তাঁহার শক্তি। ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বেদসৃষ্টি করিয়াছেন। বেদকে শব্দ* বলে; কারণ, শব্দ দ্বারা সকল পদার্থের জ্ঞান হয়; সুতরাং তাঁহার শক্তি বাগীশ্বরী বিশ্বও সৃষ্টি করেন, শব্দও সৃষ্টি করেন। অর্থযুক্ত শব্দ বা বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তিনি বাগীশ্বরী। মানুষে কোন পদার্থ প্রস্তুত করিতে যন্ত্রের সাহায্য লইয়া থাকে। এই জ্ঞান হইতেই পরমেশ্বরী ও সৃষ্টিযন্ত্রের কল্পনা করা হইয়াছে। এই যন্ত্রটি একটি পদ্মের আকার-বিশিষ্ট। যন্ত্রের মধ্যভাগে 'পীঠ'। চতুঃপার্শ্বে 'কর্ণিকা'। যন্ত্রের বহির্দেশে আটটি 'দল' আছে। পীঠের অভ্যন্তরে 'হ+স+ঔ+ঃ' বা 'হসৌঃ'। ইহার মানে কি? হ-কার বলিলে আকাশ বুঝায়; স-কার সুধার জ্ঞাপক, ঔ-কার রসনার দ্যোতক; 'ঃ'-বিসর্গ সৃষ্টির জ্ঞাপক। ইহাই সৃষ্টির মূল বা কেন্দ্রশক্তি। অনন্ত আকাশে অমৃতের চিরসংযোগ আছে। সেই অনন্ত সুধা-সমুদ্রে রসনার অর্থাৎ বাসনার তরঙ্গ উঠিলে প্রলয়ার্ণবে লীন পদার্থের উদয় হয়। সুতরাং অনন্ত অমৃত কাম ও বিশ্ব বীজরূপে কেন্দ্রে সংস্থিত হইয়াছে।

সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলেই পদার্থসমূহ অভ্যুদিত হইতে থাকে; শেষে পরিণতি লাভ করে। আমরা স্রষ্টাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু সৃষ্টকে দেখিতে পাই। সৃষ্ট পদার্থের অভ্যুন্নতির বিষয় পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একটা শক্তি বা প্রাণ সৃষ্ট পদার্থগুলির মধ্যে নিহিত আছে এবং সেই প্রাণ স্রষ্টার প্রেরণায় তাহার অভিপ্রায় অনুসারে পদার্থসমূহ গড়িয়া তুলিতেছে। সেই প্রাণই 'স্বর' এবং সেই স্বর ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মক অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক; কারণ, পদার্থ একটি রূপ ধরিয়া উঠিতে থাকে, তারপর কিছুদিন তাহার মহত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য অবস্থান করে, শেষে লয় প্রাপ্ত হয়। লীন পদার্থ আবার নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া উঠিতে থাকে। এই জন্য পীঠের পরেই কর্ণিকার মধ্যে সকল প্রাণের প্রতীক স্বরগুলি স্থাপিত হইয়াছে। স্বেচ্ছাবিহারী প্রাণের স্বরূপ সমস্ত স্বর অন্তর্গত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সেগুলি

* শাস্ত্রে 'বেদ' বুঝাইতে 'শব্দে'র যথেষ্ট প্রয়োগ আছে।

চিত্র—৪৫

ক

জাপানে সরস্বতী ('বেন্‌-তেন')

যখন ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিলিত হয় অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে থাকিয়া এক বা বহুবর্ণের বিকরণ বা আকরণ করে তখন শব্দের সৃষ্টি হয়। তাই ব্যাকরণকে শব্দশাস্ত্র বলে। প্রাণ বা ভাবগুলিকে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রের উপর তাহার ক্রিয়া হইলে তবে তাহাদিগকে চিনিতে পারি। এই দৃশ্যজগৎই সেই ক্ষেত্র, আর ইহার মধ্যে প্রীতি, প্রবৃত্তি ও বিষাদাত্মক ভাবগুলি খেলা করে। তাই স্থূলের প্রতীক ব্যঞ্জনগুলিকে 'দলে'র মধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—স্পর্শবর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ ও উষ্মবর্ণ। স্পর্শবর্ণের পাঁচটি বিভাগ, তাহাদিগকে 'বর্গ' বলে। ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ—ইহাদের উচ্চারণ-স্থান যথাক্রমে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ। শব্দ উচ্চারণ-কালে হৃদ্‌গত স্বর ঐ সমস্ত স্থানকে স্পর্শ করিয়া বহির্গত হয় বলিয়া উহাদের স্পর্শবর্ণ বলে। যে সমস্ত পদার্থের বস্তুবৎ অনুভূতি হয়, তাহাদিগকে আমরা বাস্তব জগতের অন্তর্গত বলি ; সেগুলি পঞ্চ মহাভূত। শব্দ-জগতের স্পর্শবর্ণগুলি বাস্তব জগতের ভূত-প্রপঞ্চের স্বরূপ। ক-বর্গ আকাশের, চ-বর্গ বায়ুর, ট-বর্গ তেজঃ, ত-বর্গ রসের ও প-বর্গ ক্ষিতির দ্যোতক। স্রষ্টার চিদাকাশে সিসৃক্ষার স্পন্দন উঠিলে ether বা আকাশের উদ্ভব হয় ; ব্যক্তির চিদাকাশে বিবক্ষার স্পন্দন উঠিলেই নাভি-বদ্ধ স্বরের ক্রীড়ার জন্য হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত স্থান বিবৃত হইয়া অবকাশ সৃষ্টি করে। আকাশে যখন স্পন্দন তীব্র হইয়া উঠে তখন শব্দের জনক বায়ুর উৎপত্তি হয়—তীব্রতর হইলে তেজের উৎপত্তি হয়। যে স্পন্দনে তারা গ্রামের নিষাদ স্বরের উৎপত্তি হয় তাহা হইতে তীব্র স্পন্দনে ক্ষীণ নীলাভ জ্যোতির বিকাশ হয়। ইহাই তেজের প্রথম স্বরূপ। এই তেজই রসের জনক এবং রস ঘনীভূত হইয়া ক্ষিতির উদ্ভব হয়। বিশ্বসৃষ্টির এই ক্রম। বিশ্বের বিস্রস্ত বীজসমূহ অনন্ত আকাশে একদেশে জমাট বাঁধিতে বাঁধিতে বাষ্পাকার ধারণ করে ; ক্রমে অগ্নিময় হয় ; তারপর জলময় হইয়া শেষে স্থূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তালুতে জিহ্বার স্পর্শে বায়ুর অনুভূতি হয়। মুখে সিস্ দিলেই জিহ্বার অবস্থান বুঝিতে পারা যায়। তারপর মূর্ধায় আসিয়া আঘাত পড়িলে ধ্বনির তীব্রতা আসিয়া পড়ে। এই তীব্রতাই তেজের স্বরূপ। দন্তের সহিত জিহ্বার স্পর্শে শব্দের তারল্য আসে। দন্তমূলে রসের বা লালার স্থান। যাহারা তোতলা কিংবা যাহারা দন্তমূল স্পর্শ করিয়া কথা কহিয়া থাকে তাহাদের মুখে লালা পড়ে। ওষ্ঠাভিঘাতে যে ধ্বনির উদ্ভব তাহা স্থির ও দৃঢ়। এই সকল কারণে কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য ও ওষ্ঠমূলীয় বর্ণগুলি যথাক্রমে আকাশ, অনিল, অনল, সলিল ও পৃথ্বীর জ্ঞাপক।

বর্ণপঞ্চকের প্রত্যেকটিতে পাঁচ-পাঁচটি বর্ণ থাকিয়া পঞ্চীকৃত মহাভূতকে নির্দেশ করিতেছে ; কারণ কোন ভূতই একাকী ও স্বাধীন নয়—পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে সমাবিষ্ট।

তারপর অন্তঃস্থবর্ণ একটি দলে সন্নিবিষ্ট। অন্তঃস্থবর্ণ, অন্তঃস্থ প্রাণ বা

অন্তঃসংজ্ঞ ভূতসমূহ। এই অন্তর্গত প্রাণই দেবতারূপে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। পার্থিব প্রাণ ইন্দ্র—ল-কার। তৈজস প্রাণ অগ্নি—র-কার। বায়ব্য প্রাণ মাতরিশ্বা য-কার, আপ্য প্রাণ বরুণ ব-কার।

অষ্টম দলে উষ্মবর্ণ সন্নিবিষ্ট। এখানে প্রাণের পূর্ণ বিকাশ, চেতনার পূর্ণ ক্রিয়া আছে। এই জৈব বর্ণের উষ্মাই স্বরূপ। সেই জন্য যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ উষ্মা। উষ্মা গেলেই লোকে বলে মরিয়াছে। আর এই উষ্মা কমিতে থাকিলেই লোকে ভীত হইয়া হাহাকার করে। এই বর্ণ পুরুষ ও প্রকৃতি সংজ্ঞক। হ-কার পুরুষ; স-কার—প্রকৃতি। আবার প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া স-কার শ ষ স ভেদে তিনরূপ। স-কার অর্থাৎ শ ষ স সেদিক দিয়া তমঃ রজঃ ও সত্ত্বের প্রতীক।

ঈশানকোণে অবস্থিত অষ্টম দলে ল, ক্ষ অবস্থিত। এ দুটি অমা-কলার ন্যায় লীন এবং ক্ষীণ প্রাণের স্বরূপ। প্রাণ যদি একেবারে অদৃশ্য হয়, তবে তাহার অধিষ্ঠানভূত দেহে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারা যায় না। রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া মরণোন্মুখ হইলে লোকে বলে প্রাণটি ধুক-ধুক করিতেছে মাত্র: এই ক্ষীণ প্রাণ সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের চেষ্টায় পুনরুদ্দীপ্ত হইলে দেহের ভৌতিক পদার্থ-সমূহ পুষ্ট হইয়া উঠে এবং রোগী নিরাময় হইয়া মহাবল ধারণ করিতে সমর্থ হয়। এই ক্ষ-কার সৃষ্টির মেরু, বর্ণরূপী সবিতা তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না: সেইজন্য মাতৃকা বা জনয়িত্রী বর্ণ-সমূহের মালা জপ করিতে হইলে আরোহে 'কং' হইতে 'ক্ষং' পর্যন্ত এবং অবরোহে 'ক্ষং' হইতে 'কং' পর্যন্ত জপ করিতে হয়। আরোহে সৃষ্টির বিকাশ (evolution) হয় এবং অবরোহে সৃষ্টির বিলয় (involution) হইয়া থাকে। অষ্টদলে সমস্ত মাতৃকাবর্ণকে সন্নিবেশিত করিলে প্রত্যেক দল-সন্নিহিত কর্ণিকার মধ্যে দলস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণস্থানে অবস্থিত স্বরগুলিকে স্থাপিত করা হইয়াছে। অ আ কণ্ঠমূলীয় বলিয়া ইহাদিগকে ক-বর্গাধিষ্ঠিত দলের নিম্নে স্থাপন করা হইয়াছে।

ইহাই হইল বাগীশ্বরীর সৃষ্টি-যন্ত্র। যেখানে ইহার অবস্থান তাহাই ইহার ক্ষেত্র বা ভূমি। তাই যন্ত্ররচনার প্রণালী অনুসারে একটি অপূর্ব চতুষ্কোণ ক্ষেত্রও কল্পনা করা হইয়াছে। চারিদিকে বরুণবীজ—'বং' বসান হইয়াছে এবং 'বং' সন্নিধানে রেখাভঙ্গি-প্লাবিত জলের নিরোধ জানাইতেছে। এই প্রলয়-পায়োধিজলে যে ক্ষেত্রের কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার শক্তিধর কোণ চারিটিতে চন্দ্রবীজ 'ঠং' রক্ষা করা হইয়াছে। ইহাই সুধা। অসীমকে সসীম ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তাহার মধ্যে সুধাসমুদ্রের কল্পনা করা হইয়াছে এবং সেই সুধাসমুদ্রের মধ্যস্থলে বাগীশ্বরীর বিশ্বরচনার যন্ত্র স্থাপিত।

চিত্র—১৬

খ
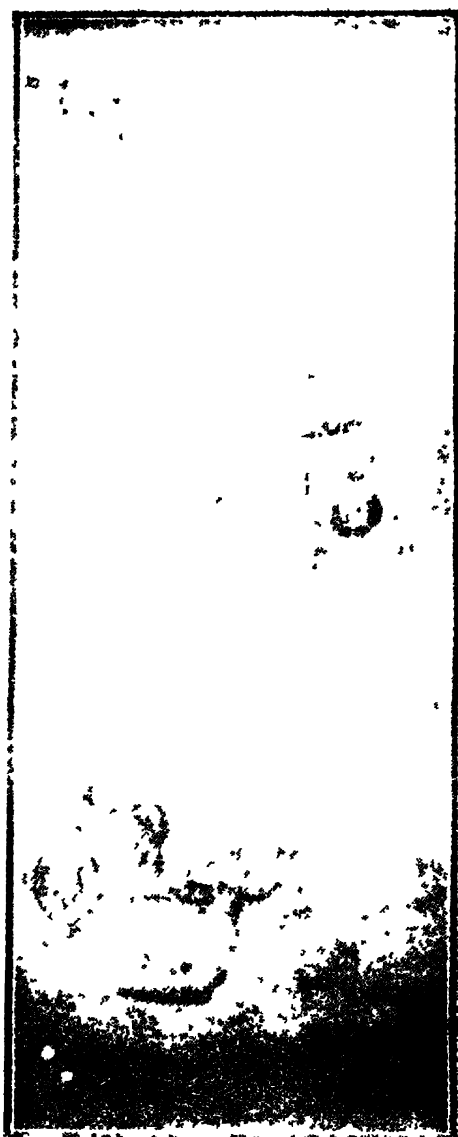
জাপানে সরস্বতী ('বেন্‌-তেন')

পরিশিষ্ট

লেখমালায় সরস্বতী

নদী-রূপা

নদীরূপা সরস্বতীর উল্লেখ নানা শিলালেখ ও তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়। নিম্নে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হইল ঃ—

১। সারঙ্গদেবের রাজত্বকালের চিন্ত্র প্রশস্তিতে পাওয়া যায়—

সরস্বতীসাগরসংপ্রযোগবিভূষিতাভোগমথাগমদ্যঃ।
সোমেশচূড়াবলমানবালচন্দ্রপ্রভাসং বলিতং প্রভাসং। ৩১ শ্লোক

—Epigraphia Indica, vol I, p. 283

ত্রিপুরান্তক শেষে উত্তর-পশ্চিমে ফিরিয়া গিয়া দেবপত্তন বা প্রভাসে আগমন করেন। এখানে সরস্বতী সমুদ্রাভিমুখিনী। প্রভাস=দেবপত্তন=সোমনাথপত্তন। দেবপত্তন কাঠিয়াবাড়ের শৈবতীর্থ।

২। কনৌজের মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালের পেহোয়া (Pehoa) প্রশস্তি স্রগ্‌ধরাছন্দে বলিতেছেন—সরস্বতীর (সুন্দর) জলপ্রবাহ তোমাদের দুরিত দূর করিয়া ফেলুক। ভবার্ণবতরণে এই স্রোত নৌকাস্বরূপ, সুরপথগমনে ইহা স্যন্দনস্বরূপ, প্রলয়কালীন বহ্নিবর্ষী এবং পঙ্কবিধ্বংসী ভানুস্বরূপ যিনি নানা ব্যাধিরূপ প্রচুরতর তম নাশ করেন।

— — ০ ধৌ সুরপথগমনে স্যন্দনস্সাধু [বর্গ] — —— । ত বহে ৫ প্রলয়জলধরসম্পৎসান্দ্রাধরঃ। নানাব্যাধিপ্রবন্ধপ্রচুরতর তম ৫ পঙ্কবিধ্বংসভানুনীর-স্তৈতৎ সমস্তাদ্যাতু দূরিত ০ — — ০ [স] রস্বতংবঃ। ৪

৩। পূর্ণপালের বসন্তগড় লিপিতে বটপুরের অবস্থিতি সরস্বতী নদীর উপর বলিয়া অঙ্কিত। —Ep. Ind., vol. 9. p. 12

ইন্দ্রস্থানমিবাপরং বটপুরং ক্ষেণীতলে সংস্থিতম্। ২৩
স্বরুগতা যত্র সরিৎ-সরস্বতী স্বপানপর্ত্তীক নৃণাম্। ২৪

দেবীরূপা

১। ওঁ॥ বংদে সরস্বতীং দেবীং যাতি যা কাং [ব] মানসং নী [রমা] না [নিজেনে] ব [যানমা] নস [ব]। সি [। ।]। ১ যঃ [ক্ক] ।ং তি মা [নপ্যাং] রু [ণঃ পকীপে শাং তোপি দীপ্ত]ঃ স্মরনিগ্রহায়। নিমীলিতাক্ষো [পি সম] গ্রদর্শী [বাত] নুজঃ॥

* * * *

দেবী সরোজাসনসং ভবাং কিং কামপ্রদা কিং সুরসৌরভেয়ী।
প্রহ্লাদনাকারধরা ধরাধামাধাতবত্যেষ ন নিশ্চয়ো মে ॥ ৩৯ শ্লোক
আবুলিপি—Ep. Ind., vol viii, p. 216

ওঁ। আমি কবিমানসগামিনী সরস্বতীকে বন্দনা করি যিনি নিজ যানরূপমানস দ্বারা নীতা।

* * * *

দেবী সরোজাসন-(ব্রহ্মা) সম্ভূতা অথবা ধরাধামাগতা
প্রহ্লাদন-আকৃতিধরা কামপ্রদা সুরসৌরভেয়ী।
—দেবপাল ও ২য় জয়বর্মার মান্ধাতা লিপি।

২। কাব্যগাংধর্ব-সর্ব্বস্বনিধিনা
যেন সাং প্রতং। ভারাবতরণং দেব্যাশ্চক্রে পুস্তকবীণয়োঃ। ১৮
—Ep. Ind., vol 9, p. 109

কাব্য-গান্ধর্বনিধি অর্জুন সম্প্রতি দেবীকে (সরস্বতীকে) তাঁহার পুস্তক ও বীণার ভার হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

৩। প্রোলের (Prola) অন্মকোণ্ড লিপি
পংক্তি ৫০। অতিশয়-জৈন-ধর্ম-সময়োচিত
৫১। শাসনদেবি ভারতী সতি শসি (শ) বিস্ববক্ত্র ইত্যাদি
—Ep. Ind., vol 9, p. 257

বেত নামক মন্ত্রীর পত্নী জৈনধর্মমতোচিত শাসনদেবী ভারতীস্বরূপা ছিলেন।
—খ্রীস্টীয় ১০০১ অব্দের লিপি।

৪। পশুপতিবদনচ্ছদ্মনি কৃতবসতিঃ পদ্মসদ্মনি সদা যা।
জয়তি বিলক্ষণরূপা সু [স্ত] ক্লাভা ভারতী ভ্রমরী ॥ ৪
—Ep. Ind., vol I, p. 140

৫। বালাদিত্যের চাট্‌শু লিপি (দশম শতক)
বাক্স [স্ম] ০ স্বাব্জশ্রীঃ শ্রীমতা যা বি [রো] ধিনী। তাং বন্দে বাগ্ময়ীং দেবীং বাক্‌প্রপঞ্চ সিদ্ধয়ে। ১ —Ep. Ind., vol xii, p. 13

[জয়পুররাজ্যে জয়পুর নগর হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে চাট্‌শু নামক স্থানে এই লিপিটি পাওয়া গিয়াছিল]

৬।

* যোধপুর স্টেটে ভিড্‌বানা নগরের ২০ মাইল দক্ষিণে লাডনু।

চিত্র—৪৭

সরস্বতী-মন্দির

(হাওড়া পঞ্চাননতলা
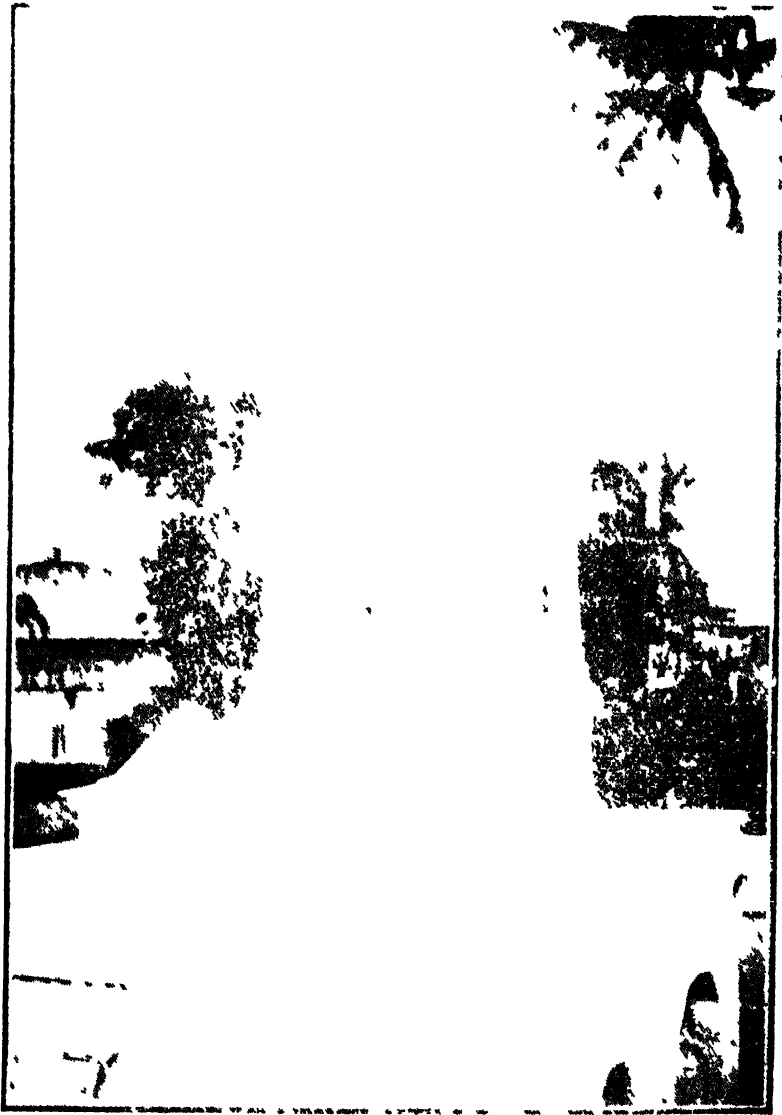
প্রজাগণপতি-স্তুতি, তৎপরে সরস্বতী-স্তুতি, তারপর বরুণ-স্তুতি

"যা [শোক্লীং] দ্যুতিমাতনোতি বিলসস্মন্ত্রাবলোবং"*
দ্রমশ্চং চ (ং কং) বতুষারকুন্দকলিকাকর্পূর পুরোত্তরাং। য (া)
খ (ধ) ব্রা হরিণাহরেণ সততং সর্ব্বার্থসিদ্ধৈ স্তুতা [।] সা বঃ
পাতু সরস্বতী ভগবতী ন্যা † [ন] প্রদা সর্ব্বদা ॥

৭। [১১২৫ খ্রী°]

"জলধিপ্রাবৃতধাত্রিয়োল্লেগন্দনলতে শব্দবিদ্যা পতঞ্জলি সত্তর্কষড়াননম্ সকল-লোকস্তুত্য সাহিত্যসঙ্কুলসর্ব্বজ্ঞানুদাত্ত নীতিনিকরপ্রখ্যাত চাণক্যনুঞ্জলবাণীবর্ণিতানটী-নটনলীলাপ্রাঙ্গণম্ সিংগন ॥ ৪৮"

"কৃতবিদ্যম্ শব্দশাস্ত্রাগমোদোলবিগতার্থম্ মহাতর্কশাস্ত্র-শ্রুতিয়োল্সাহিতশাস্ত্র-প্রকরদোলবিকম্ কোবিদম্ শুক্রশাস্ত্রোন্নতিয়োল্ ভূলোকদোলভাগ্গর্বনোনিসিযশম্ বেত্তু সংস্তুত্য সারস্বত-লক্ষ্মী শুদ্ধজিহ্বম্ নেগবল্দন। নীযোল্ সোমদত্তাধিনাথম্ ॥ ৪৪"

—Ep. Ind. vol. xiii, p. 306

৮। দ্বিতীয় মুংগি-লিপি

বগে সাহিত্যরসপ্রপূর্ণবিপুলস্রোতং শ্রুতং বাগ্বধূটিগে কৈগংনতি সূক্তি সুণৃত-সুধাবারাশিমুস্তানি নালগে সারস্বতপি(পী)ঠবাপ্ন্ বরবিপ্রব্রাত-বিদ্বজ্জনালিগে… ইত্যাদি।

—Ep. Ind., vol. xv, p. 36

৯। প্রকাশধর্মার

My-son Stelae লিপি
(৫৭৯ শক)
বিবৃদ্ধিমেতি ত্রিতয়ং যমেত্য পদ্মা
চ কান্তিশ্চ সরস্বতী চ
প্রায়েণ সংস্থানমভিপ্রপন্ন (ম্) স্ববীজমানস্তা

—Champa, p. 202

১০। ৯৯৬ শকের (১০৭৪-৫ খ্রী°) একখানি সংস্কৃত ও প্রাচীন কন্নড় শিলা-লিপিতে "যোগেশ্বরপণ্ডিতদেব"কে "সরস্বতীকর্ণাবতংসরূং" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। (I. A., vol x. (1881) p. 128, line 31-32)। আর একটি লিপিতে (নং ১১৬) ধর্ম্মবোলের (ধর্মপুরের) ১৬ জন সৌট্টকে—"সরস্বতী-কর্ণ-কুণ্ডলাভরণরূং" বলা হইয়াছে। এটি ১০১৭ (১০৯৫—৯৬ খ্রী°)।

---

* চং পাঠ করিতে হইবে। † জ্ঞা পাঠ করিতে হইবে।

১১। মাণ্ডু হইতে দুইখানি ভগ্ন ক্ষোদিত প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পাথর দুইখানি পাশাপাশি রাখিয়া পাঠোদ্ধার করিয়া দেখা গিয়াছে যে ক্ষোদিত অংশটি একটি সরস্বতী স্তোত্রের কিয়দংশ। দেখা যাইতেছে বিদ্যোৎসাহী রাজগণ তাঁহাদের আশ্রিত কবিগণের কীর্তি কেবল তালপত্রে নিবন্ধ করিয়াই নিরস্ত হ'ন নাই। সর্বসাধারণের পাঠের সুবিধার জন্য প্রস্তরগাত্রে ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছেন।

[ওঁ নমঃ] সরস্বত্যৈ ॥ স্বয়িকল্পলতা—
······ভিন্নভাবা জয়তি পরং ভারতী
[স] কনা ধর্ম্মাঃ সরস্বত্যেকসংশ্রয়াঃ। অ
বামিতি ধ্বনি মধ্যাপি ॥ ভারতী ভা [তি]
ম্ভবো ভবতু চেম্ভবতী ময়া নিবা
রীতভর্বতি কস্য ন যোগিনো
ক্তচ্ছন্দসাং ভেদা মূর্ত্তি দত্তে সরস্ব[ত্যাঃ]
সৎকবিঃ স কিমুচ্যতাম্। নি
[অ] ন্যোন্যো (?) ণ' স্যাম্মহাকবিঃ
তৈম্ধরিত্রী নিস্তোভূতা
সোঽনুগ্রহঃ খলু গির
চতুর্ব্বর্গায় বাল্মীকিব্যা [সাদয়ঃ]
ঘোটযন্নংদিনীং বীরেশ[ঃ]
[নি] বর্ত্ত্য চরণে ধেনুং মুনেঃ
— —[দম্ভ] দুম্ভপনিদর্শনম্

—Annals of the Bhandarkar Institute, vol viii, p. 142

তিব্বতে সরস্বতী

dbyans can—সরস্বতী. অমরকোষ (তিব্বতী অনুবাদ)—A. S. B. পৃ° ৪০৮, ১৫১
dbyans can ma = স্বরবতী—সরস্বতী স্বর + মতুপ্ + ঙীপ্

—S. C. Das : Tibetan Dictionary, p. 913

সরস্বতীর বিভিন্ন নাম

১। tshans pahi srasmo (Brahma-of-daughter)—ব্রহ্ম-কন্যা
২। dbyans ldan ma [sound-having + fem. suffix—a female having (good) sound—স্বরবতী (সরস্বতী)]

চিত্র—৪৮

বাগীশ্বরীযন্ত্রম্

চিত্র—৪৯
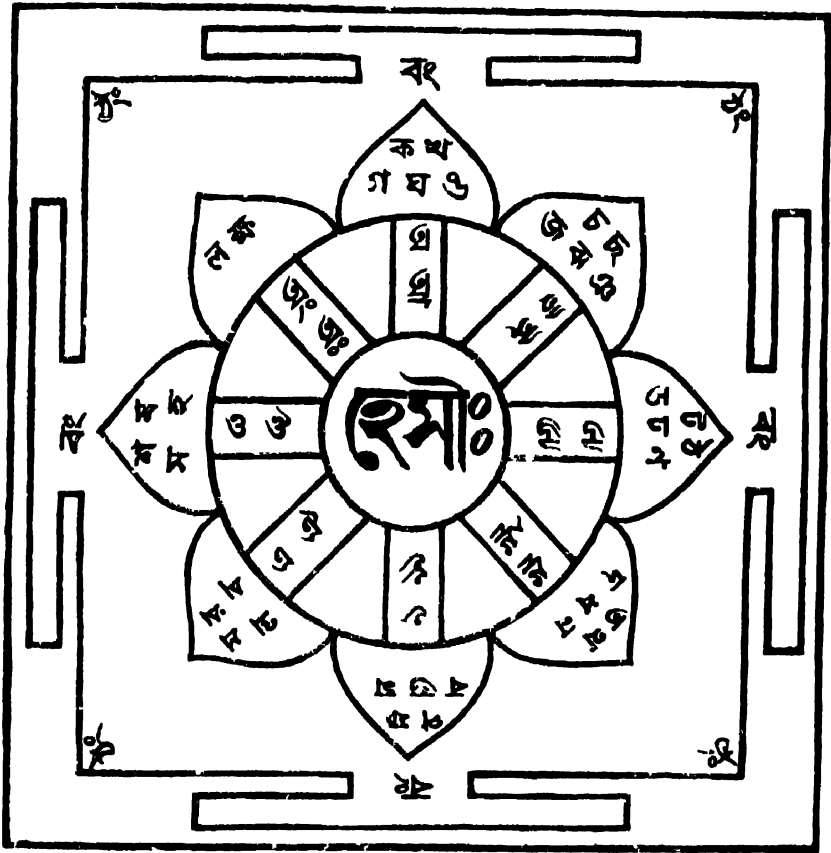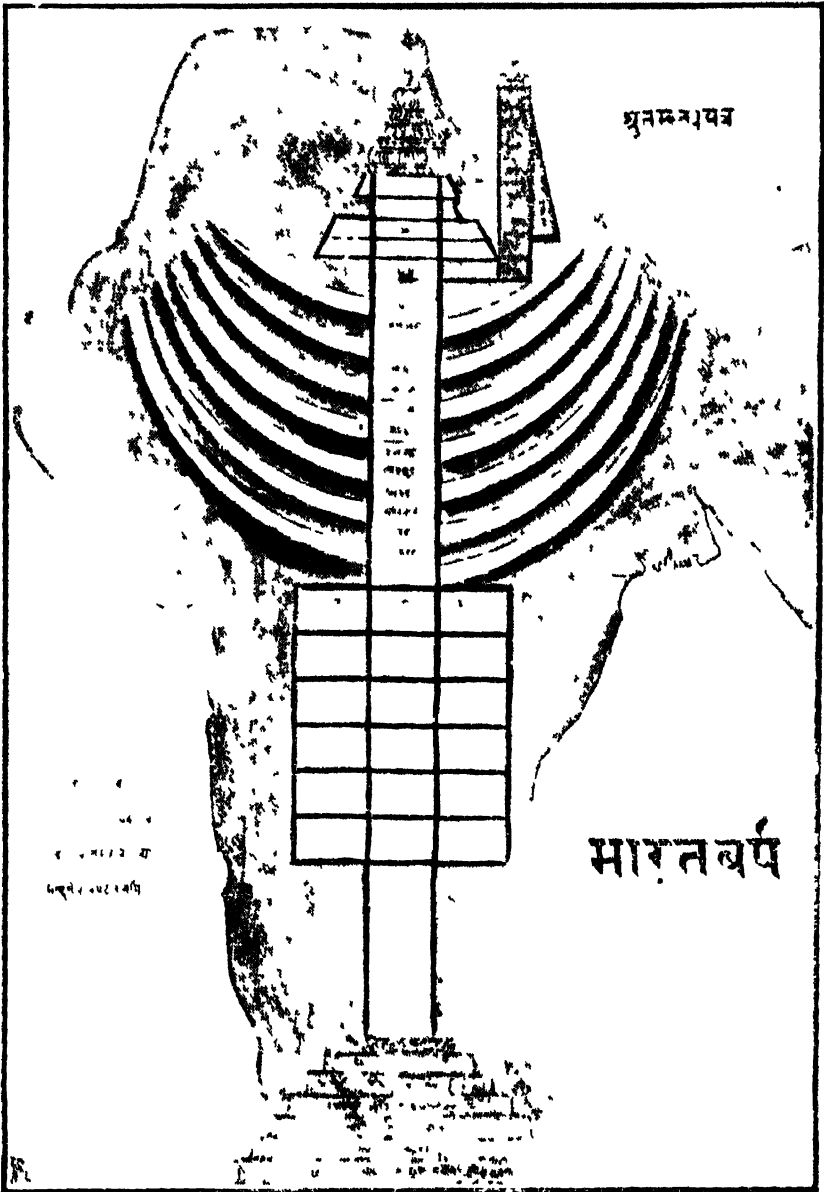
শ্রুতস্কন্ধ-যন্ত্র—জৈন
(সরস্বতী-যন্ত্র)

৩। Sgra dbyans lha mo [sgra dbyans = pleasing tone, harmony নির্দোষ ; lha mo = দেবী ; goddess of sweet sound, নির্দোষ দেবী]
—S. C. Das, p. 331

৪। Sma lha mo [sma = বাক্য ; lha mo = দেবী]—বাগ্দেবী

৫। rgya-mtshohı lha mo [rgya = বিস্তৃত ; mtshohi = সব ; rgya-mtshohı সমুদ্র]—সমুদ্রদেবী

৬। mtsho ldan ma [সরস্ + মতুপ্]—সরস্বতী

৭। zla bahı srın mo [zla bahı = চন্দ্র ; srin mo ভগিনী] = চন্দ্রস্বসা

৮। Ser hla mo [ser = প্রজ্ঞা ; hla mo = দেবী] = প্রজ্ঞাদেবী

৯। nag dban lha mo [nag = বাক্ ; dban = শক্তি, lhamo = দেবী]
= বাক্শক্তিদেবী

১০। blo yı gler—bloyi [ıntellıgence ; gler = treasure] এটি মঞ্জুশ্রীরও একটি নাম।—S. C. Das, p. 905

১১। rdo rje dbyíns kyi dban phyngma [rdo rje = বজ্র ; dby ins kyi = ধাতু ; dban phyng ma = ঈশ্বরী ; বজ্রধাত্বীশ্বরী] —S. C. Das, p. 909

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন

সুপণ্ডিত উডরফ মহাশয়ের তন্ত্রালোচন গ্রন্থ হইতে ও ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের গ্রন্থ হইতে দু-এক স্থানে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার ও শ্রীযুক্ত কে এম দীক্ষিত—এই চারিজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং মাদ্রাজের বর্তমান প্রত্নশালাধ্যক্ষ ও আমার ছাত্র শ্রীমান্ ধর্মাচার্য কয়েকখানি চিত্র দিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। বন্ধুবর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকটেও কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছি। (অধুনা পরলোকগত) এ এ ম্যাকডোনেল পুষ্কর ও পুণ্ডরীক প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি উপকরণ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

১৩৪০, শ্রীপঞ্চমী

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

॥ নির্ঘণ্ট ॥